আজাদ-হিন্দ গ্রন্থমালা

প্রথম বই : দিল্লী চলো

দিল্লী চলো

নেতাজি

সুভাষচন্দ্র বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

আড়াই টাকা

ফাল্গুন, ১৩৫২

বেঙ্গল পাবলিশার্স'র পক্ষে প্রকাশক শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বেঙ্গল ইউনাইটেড ট্রেডার্স লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগের [ম্যাগনেট প্রেস—৩৫, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা] পক্ষে মুদ্রাকর—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা

আজাদ-হিন্দ গবর্নমেণ্ট, আজাদ-হিন্দ ফৌজ ও নেতাজীর অলৌকিক কর্মকাহিনী আজ ইতিহাসের বস্তু। দুর্বার সংগঠন-শক্তি, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়, সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতার কৃত্রিম বিভেদ অবলীলাক্রমে বিলুপ্ত করে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে সর্বস্বত্যাগে অনুপ্রাণিত করেছিল,—তার সকল সংবাদ-লাভের জন্য মুক্তিকামী দেশবাসী উদ্গ্রীব হয়ে আছেন।

আজাদ-হিন্দ সংঘ (ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ) হেড কোয়ার্টার্স থেকে Blood-bath (রক্তস্নান) নামে নেতাজির কতকগুলি রচনা ও বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। সেই বইটির সমগ্র এবং আরও চারটি বক্তৃতার প্রাঞ্জল অনুবাদ সুষ্ঠু মুদ্রণে পরম শ্রদ্ধায় গ্রন্থাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। আজাদ-হিন্দ গবর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য, ইউরোপ, পূর্ব্ব-এশিয়া ও ভারতবর্ষের সমসাময়িক ঘটনাবলীর সুনিপুণ বিশ্লেষণ এবং নেতাজির অনন্য দেশপ্রেমের পরিচয় রচনাগুলির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রকাশকেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই বইয়ের অর্ধেক লভ্য আজাদ-হিন্দ ফৌজ সাহায্য-ভাণ্ডারে দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

১নং উডবার্ণ পার্ক
২০শে ফাল্গুন, ১৩৫২

অমিয়নাথ বসু

আজাদ-হিন্দ গ্রন্থমালার নিম্নোক্ত বইগুলি ছাপা হচ্ছে—

দ্বিতীয় বই : **মুক্তি-পতাকা তলে**

বৃটিশ করস্খলিত ব্রহ্মের অবস্থা, নেতাজি ও আজাদ-হিন্দ ফৌজের অভ্যুত্থান, পুনরায় ব্রহ্ম-বিজয়……প্রত্যক্ষদর্শীর পরিচিত্রণে উপন্যাসের চেয়ে মনোরম।

তৃতীয় বই : **নেতাজি ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ**

বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্যে পূর্ণ প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত, নেতাজির পূর্ণাঙ্গ জীবন চিত্র।

চতুর্থ বই : **আরাকান ফ্রণ্টে**

লেখক আরাকান ফ্রণ্টে যুদ্ধ ব্যাপারে নিজে জড়িত ছিলেন। কাহিনীর আগাগোড়া নিজের চোখে দেখেছেন।

এই গ্রন্থমালার আরও বই প্রকাশিত হবে।





অব্ দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলেংগে
রোকেন হম কিসী কে রুকেঁ হৈঁ, ন রুকেংগে ॥
ঝণ্ডা তিরংগা লাল কিলে পৈ উড়ায়েংগে
'জয় হিন্দ্' কে নারোঁ[১] সে ফলক[২] কো হিলায়েংগে।
হিন্দোস্তাঁ মে হিন্দী হী অব রাজ করেংগে
অব্ দিল্লী চলো,... ... ...

১। নারোঁ—জয়ধ্বনি। ২। ফলক—আকাশ।

আগে হী বঢ়েংগে ন কিসী সে ভী ডরেংগে

হম মৌত[৩] কা ভী সামনা হঁস হঁস কে করেংগে।

অব্ পাক[৪] জমী পৈ ন উদু[৫] পাঁও ধরেংঙ্গে ॥

অব্ দিল্লী চলো,... ... ...

অংগরেজ চলে জাঁয়, এ হৈ দেশ হমারা।

প্রাণো সে হৈ প্যারা হমে এ জী[৬] সে দুলারা[৭]।

ইস কে লিয়ে সর রখকে, হথেলী[৮] পৈ লড়েংগে ॥

"ইমান[৯]কে বু[১০] হিন্দীয়োমে গরচে[১১] রহেগী।

লন্দন পৈ তেগে[১২] হিন্দ বঢ়েগী, ঔর পঢ়েগী"

শাহে[১৩] জফর কে কৌল[১৪] কী হম শান[১৫] রখেংগে ॥

অব্ দিল্লী চলো,... ... ... ॥

৩। মৌত—মৃত্যু। ৪। পাক—পবিত্র। ৫। উদু—শত্রু। ৬। জী—হৃদয়। ৭। দুলারা—প্রিয়। ৮। হথেলী—হাতের তালু। ৯। ইমান—সততা। ১০। বু—সৌরভ। ১১। গরচে—যদি। ১২। তেগ—তলোয়ার। ১৩। শাহে—বাদশাহ (ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর) ১৪। কৌল—প্রতিজ্ঞা। ১৫। শান—গৌরব।

ভাবার্থ। দিল্লী, দিল্লী আমি যাব, কোন বাধাই আমি মানব না। লাল-কেল্লার উপরে ত্রিবর্ণ-পতাকা উড়াব আমি, 'জয় হিন্দ' ধ্বনিতে আকাশকেও কাঁপিয়ে দেব, হিন্দুস্থানে এবার হিন্দুস্থানীই রাজত্ব করবে। এগিয়ে যাব, ভয় করব না না কাউকে, হাসিমুখে মৃত্যুরও সম্মুখীন হব, আমাদের পবিত্র ভূমিতে শত্রুকে পা রাখতে দেব না। এ দেশ আমার, ইংরেজ চলে যাক, প্রাণের চেয়ে প্রিয়, হৃদয়ের চেয়েও প্রিয় আমার এই দেশের জন্য আমি মৃত্যুপণ করে লড়াই করব। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে এতটুকু সততা থাকে তো বাদশাহ্ জাফরের প্রতিজ্ঞা 'লণ্ডন পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের তলোয়ার এগিয়ে যাবে'—সে প্রতিজ্ঞার আমি গৌরব রাখব।

দিল্লী চলো

ভারতের স্বাধীনতার সেনাদল, আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গর্ব্বের দিন। আজ ঈশ্বর আমাকে এই কথা ঘোষণা করার অপূর্ব্ব সুযোগ এবং সম্মান দিয়েছেন যে, ভারতকে স্বাধীন করার জন্য সেনাদল গঠিত হয়েছে। সিঙ্গাপুর একদিন বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রাকারস্বরূপ ছিল; সেই সিঙ্গাপুরেই আমাদের বাহিনী এখন ব্যূহবদ্ধ অবস্থায় আছে। এই বাহিনী শুধু যে ভারতবর্ষকে বৃটিশের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত করবে তাই নয়, এর পর এই সেনাদলকেই ভিত্তি করে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয়-বাহিনী গড়ে উঠবে। প্রত্যেক ভারতবাসী এই বাহিনীর জন্যে গর্ব্ববোধ করবে। এই বাহিনী তাদেরই নিজ বাহিনী, সম্পূর্ণ ভাবে ভারত-বাসীদের নেতৃত্বে এ বাহিনী গঠিত হয়েছে। ঐতিহাসিক মূহূর্ত্ত এলে ভারতীয় নেতৃত্বেই এ বাহিনী রণক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে।

বৃটিশ-সাম্রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হয় না, বৃটিশ সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী—একদিন লোকের মনে এই বিশ্বাস ছিল। আমি কোনদিনই এ ধরণের চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। ইতিহাস থেকে আমি এ শিক্ষা পেয়েছি, প্রত্যেক জাতিরই কোন না কোন সময়ে অধোগতি এবং পতন অনিবার্য্য। তাছাড়া, একদিন যেসব নগর ও দুর্গ সুরক্ষিত ছিল সেগুলো কি ভাবে সাম্রাজ্যের সমাধিভূমিতে পরিণত হয়েছে তাও আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আজ বৃটিশ-সাম্রাজ্যের সমাধির উপর দাঁড়িয়ে যে কোন শিশুও এই সত্য বুঝতে পারবে যে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য অতীতের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ১৯৩৯ অব্দে ফ্রান্স যখন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে

যুদ্ধ-ঘোষণা করে, তখন জার্মান সেনাদের কণ্ঠে শুধু এই একটা ধ্বনি ছিল—প্যারিস চলো, প্যারিস চলো! ১৯৪১-এ অভিযান আরম্ভ করার সময় জাপানি সেনাদের মুখেও ছিল একই কথা—সিঙ্গাপুর চলো, সিঙ্গাপুর চলো!

হে আমার সতীর্থগণ, সেনাদল, তোমাদেরও রণধ্বনি হোক্—দিল্লী চলো, দিল্লী চলো! স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে আমরা কে কতদিন বেঁচে থাকব জানি না; তবে একথা আমি নিশ্চয় জানি, চরম জয়লাভ আমরা করবই, এবং প্রাচীন দিল্লীর লাল-কেল্লায় বিজয়োৎসব সম্পন্ন না করা পর্য্যন্ত আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হবে না।

দেশসেবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করার পর সব সময় আমার মনে হয়েছে, অন্য সব বিষয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হলেও একটি বিষয়ে তার অভাব আছে—তার স্বাধীনতা-প্রয়াসী সেনাদল নেই। সেনাদল ছিল বলেই আমেরিকার জর্জ্জ ওয়াশিংটন সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পেরেছিলেন। গ্যারিবল্ডীর পিছনেও সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী ছিল বলে তিনি ইটালীকে স্বাধীন করতে পেরেছিলেন। তোমাদের সৌভাগ্য এই, তোমরা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠনের অগ্রণী হবার সুযোগ এবং সম্মান পেয়েছ। এই ভাবে তোমরা আমাদের স্বাধীনতা-লাভের পথে শেষ বাধাকে অপসারিত করেছ। এমন মহৎ ব্রতের পুরোভাগে তোমরা, অগ্রদূত তোমরা—এ জন্যে সুখী হও, গর্ব্ববোধ কর।

আমি তোমাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,—সে কর্ত্তব্য দ্বিবিধ। অস্ত্রবলের দ্বারা এবং নিজেদের শোণিতোৎসর্গ করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে। তারপর ভারত যখন স্বাধীন হবে, তখন স্বাধীন ভারতের জন্যে স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে তোমরাই। তখন কর্ত্তব্য হবে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করা। তোমরা আমাদের দেশরক্ষার

শক্তি এমন অটল ভিত্তির উপর স্থাপন করবে যেন আর কোনদিন আমরা স্বাধীনতা না হারাই। সৈনিক হিসাবে তোমাদের তিনটি আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করতে হবে এবং তদনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালিত করতে হবে। বিশ্বস্ততা, কর্ত্তব্যপালন এবং আত্মত্যাগ—এই তিনটি হবে তোমাদের আদর্শ। যে সব সৈনিক জাতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, যারা কোন অবস্থাতেই কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হয় না; যারা আত্মত্যাগের জন্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত, তারা হয় অজেয়। তোমরাও যদি অজেয় হতে চাও, তবে অন্তরের অন্তস্তলে এই আদর্শ তিনটি গভীর ভাবে এঁকে রাখ। যে প্রকৃত যোদ্ধা, তার সামরিক ও আধ্যাত্মিক—উভয় প্রকার শিক্ষাই প্রয়োজন। তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের এবং সতীর্থদের এমন ভাবে শিক্ষিত করে তোল যে প্রত্যেক সৈনিকের মনে যেন অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস থাকে। বিরুদ্ধপক্ষের চেয়ে তারা অনেক শক্তিশালী, এ বিশ্বাস যেন নিজেদের মনে মনে থাকে। মৃত্যু সম্বন্ধে মনে যেন ভয় না থাকে এবং সঙ্কটকালে প্রয়োজনমতো নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করার মতো কর্ম্মক্ষমতা যেন থাকে। আধুনিক যুদ্ধে সাহস, নির্ভীকতা এবং উদ্যমের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরিচালিত সেনাদল কি অঘটন ঘটাতে পারে—তোমরা তা স্বচক্ষে দেখেছ। এসব দৃষ্টান্ত থেকে যা শিখতে পার শিখে নেবে এবং আমাদের মাতৃভূমির জন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রথম শ্রেণীর সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে। যারা সেনানী, তাদের আমি বলব, তাদের কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। জগতের সর্ব্বত্র প্রত্যেকটি বাহিনীর সেনানীদের দায়িত্বই গুরুতর; আর এদের বেলা সে দায়িত্ব আরও বেশী। রাজনৈতিক দিক দিয়ে আমরা পরাধীন; তাই অনুপ্রেরণা পাবার মতো আমাদের ইতিহাসে মুকদেন, পোর্ট আর্থার অথবা সিডানের মতো কিছু নেই। বৃটিশ আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছে, তার অনেক কিছুই আমাদের ভুলে যেতে হবে এবং যে শিক্ষা দেয় নি, এমন অনেক কিছু

নতুন করে শিখতে হবে। যাই হোক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে তোমরা চলতে পারবে এবং দেশবাসী তোমাদের সুদৃঢ় স্কন্ধে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে তোমরা তার মর্য্যাদা রাখবে। সেনাদলকে গড়ে তোল। একথাও মনে রেখ, বৃটিশরা যে এত জায়গায় পরাজিত হয়েছে, তার কারণ তাদের সেনানীদের অযোগ্যতা। মনে রেখ যে, তোমাদের মধ্য থেকেই স্বাধীন-ভারতের ভাবী সেনানায়কদল গড়ে উঠবে। তোমাদের সকলকে আমি এই কথাই বলতে চাই, এই যুদ্ধকালে তোমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তা আমাদের ভবিষ্যৎ সেনাদলকে অনুপ্রাণিত করবে। যে সেনাদলের পক্ষে বীরত্ব নির্ভীকতা অপরাজেয়তা সম্বন্ধে নিজেদের গর্ব্ব করার মত অতীত স্মৃতি নেই, তারা কোন পরাক্রান্ত শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে টিকতে পারে না।

সতীর্থগণ, তোমরা স্বেচ্ছায় এ ব্রত নিয়েছে। মানব-জীবনে এ ব্রত মহত্তম। এ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে কোন ত্যাগ-স্বীকারই খুব বেশী নয়; নিজের জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ। তোমরাই আজ ভারতের জাতীয় মর্য্যাদার রক্ষক এবং ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক। এমন ভাবে চলবে যেন দেশবাসী সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করতে পারে এবং জাতির ভবিষ্যৎ বংশধররা তোমাদের জন্যে গর্ব্ববোধ করে।

আজ আমার জীবনে সব চেয়ে বেশী গর্ব্বের দিন—একথা আমি বলেছি। পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সৈনিক হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান এবং গৌরবের বিষয় অন্য কিছুই নাই। কিন্তু এই সম্মানের সঙ্গে সমপরিমাণ দায়িত্বও রয়েছে এবং সে দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি—আলোকে এবং অন্ধকারে, দুঃখে এবং সুখে, পরাজয়ে এবং বিজয়ে আমি সর্ব্বদা তোমাদের পাশে পাশে থাকব। বর্ত্তমানে তোমাদের আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ-কষ্ট, দুর্গম অভিযান এবং মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু দিতে অসমর্থ। কিন্তু

তোমরা যদি জীবনে ও মৃত্যুতে আমার অনুসরণ কর—আমি জানি তোমরা তা করবেই—তবে আমি তোমাদের বিজয় এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিয়ে যাব। আমাদের মধ্যে কে বেঁচে থেকে ভারতকে স্বাধীন দেখতে পারবে—সে কথা বিবেচ্য নয়। ভারত স্বাধীন হবে আমাদের পক্ষে সেই যথেষ্ট এবং ভারতের সেই স্বাধীনতার জন্যে আমরা সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করব। ঈশ্বর আমাদের সেনাদলকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং আসন্ন সংগ্রামে আমাদের জয়যুক্ত করুন। ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ, আজাদ-হিন্দ জিন্দাবাদ!

১৯৪৩-এর ৫ই জুলাই আজাদ-হিন্দ ফৌজের কুচকওয়াজ উপলক্ষে।

কেন দেশ ছেড়েছি

ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, আজ আপনারা আমাকে যেমন আন্তরিকতা ও আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দিত করেছেন, সে জন্যে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমার যে সব ভগ্নী তাঁদের অন্তরের অগ্নিময় স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণায় এত অধিক সংখ্যায় এগিয়ে এসেছেন, আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আজ আমি যা দেখছি তাতে আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে, আসন্ন সংগ্রামে শোনান এবং মালয়স্থিত আমার দেশবাসীরা অগ্রণীর স্থান দখল করবেন। একদিন যে স্থান বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রাকারস্বরূপ ছিল, সেই স্থান আজ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দুর্গে পরিণত হয়েছে।

আমি কেন জন্মভূমি পরিত্যাগ করে বিপদসঙ্কুল এই দুর্গম পথে পা দিলাম—সেকথা খোলাখুলি ভাবে আপনাদের কাছে বলি—এই আমার ইচ্ছা। আপনারা জানেন, ১৯২১ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণদ্বার দিয়ে বাইরে আসার পর থেকে আমি স্বাধীনতা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত আছি। গত কুড়ি বৎসরকাল আন্দোলন-ঘটিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্যোদ্যমের সঙ্গে আমি সর্ব্বতোভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। হিংসাত্মক এবং অহিংস—সকল প্রকার বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ যোগ ছিল, এবং এই সম্পর্কের সন্দেহে আমাকে বার বার বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সুতরাং আমি যদি একথা বলি, স্বাধীনতা-আন্দোলনে আমি যেমন সকল দিক থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আর কোন নেতাই সেরূপ অভিজ্ঞতা দাবী করতে পারেন

না—তবে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি, ভারতের ভিতরে থেকে আমরা যত রকমের চেষ্টাই করি না কেন, সেই চেষ্টা ব্রিটিশকে ভারত থেকে তাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট হবে না। যদি ভারতে থেকে চেষ্টা করাই আমাদের দেশের লোকের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট হত, তবে আমি অনাবশ্যক বিপদের ঝুঁকি নেবার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখাতাম না। সুতরাং সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতে যে সংগ্রাম চলছে, বাহির থেকে তার শক্তি-বৃদ্ধি করাই আমার দেশত্যাগের উদ্দেশ্য ছিল। বাইরের সমর্থন ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্যপূর্ণ অবসানের জন্যে বাইরের এই অত্যাবশ্যক সাহায্যের পরিমাণ খুব সামান্য হলেই চলে। এর কারণ এই যে, অক্ষশক্তিবর্গ বৃটিশের উপর বারম্বার পরাজয়ের আঘাত করেছে; তার ফলে বৃটিশের শক্তি ও মর্য্যাদা এমন ভাবে ভেঙে পড়েছে যে, আমাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে খুবই হালকা।

দেশবাসীর নিকট থেকে যে সাহায্য আবশ্যক ছিল এবং এখনও আছে তা দুই রকমের—নৈতিক এবং সামরিক। প্রথমতঃ, তাদের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, পরিণামে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত। দ্বিতীয়তঃ, বাইরে থেকে তাদের সামরিক সাহায্য দিতে হবে। প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে যুদ্ধের আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করে যুদ্ধের ফল কি দাঁড়াবে তা নির্ণয় করা আবশ্যক। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভারতে কিংবা ভারতের বাইরে যে সব ভারতবাসী আছে তারা তাদের স্বদেশস্থ ভারতবাসীদের কি সাহায্য দিতে পারে, তার সন্ধান করা দরকার। সেই সঙ্গে দেখতে হবে, যদি প্রয়োজন হয়—তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা।

বন্ধুগণ, আমি এখন আপনাদের একথা বলতে পারি যে, এই উভয়

উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হতে চলেছে। বিদেশে পরিভ্রমণ করে আমি স্বচক্ষে সব কিছু দেখার সুযোগ পেয়েছি এবং যুযুধান শক্তিবর্গের সামর্থ্যের পরিমাণ বুঝতে পেরেছি। আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের পতন সুনিশ্চিত। বাইরে থেকে আমি স্বদেশবাসীদেরও এ সংবাদ জানিয়েছি। এই দৃশ্য দেখে আমি আনন্দ পেয়েছি যে, জগতের যেখানে আমার যে দেশবাসী আছে তারা সবাই জেগে উঠেছে এবং দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদানের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, অক্ষ-শক্তিবর্গও ভারতকে বিদেশের অধীনতা থেকে মুক্ত দেখতে আগ্রহাকুল এবং ভারতবাসীরা যদি তাদের সাহায্য চায় তবে সে সাহায্য দিতে তারা প্রস্তুত।

বিদেশস্থ ভারতীয়দের মনোভাব সম্বন্ধে আমার এই বিশ্বাস যে, তাঁদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি ভারতের স্বাধীনতা কামনা না করেন, এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যিনি সাহায্য করতে প্রস্তুত নন। অক্ষশক্তিবর্গের মতিগতি সম্বন্ধে যদি কারও মনে কোন সংশয় থাকে, তবে তাঁকে আমি অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়ে দিতে পারি, আমাদের নিজেদের কথা বাদ দিয়ে এরাই বর্ত্তমানে আমাদের প্রকৃষ্ট বন্ধু।

আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি আমার দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারি, আমার যারা অতি-বড় শত্রু, আমার সম্বন্ধে এমন কথা বলার ধৃষ্টতা তাদেরও হবে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই যখন আমার মনের শক্তি দমিত করতে পারে নি, কিংবা আমাকে প্রতারিত ও প্রলুব্ধ করতে পারে নি, তখন জগতের অপর কোন শক্তিই তা করতে পারবে না। সুতরাং আমার কথা বিশ্বাস করুন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপনারা যে সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন, যদি তার জন্যে আপনারা বাইরের সাহায্য চান, তবে সত্যই অক্ষশক্তিবর্গ আপনাদের আনুকূল্য করবে। এই সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা, তা স্থির

করবেন আপনারাই এবং একথা বলাই বাহুল্য যে, এই সাহায্য ছাড়া যদি আপনারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারেন, তবে ভারতের পক্ষে সেটাই হবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সেই সঙ্গে একথাও আমাকে বলতে হচ্ছে যে, সর্ব্বশক্তিমান বৃটিশ গবর্নমেণ্টই যদি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাহায্য চেয়ে ঘুরতে পারে—পরাধীন ক্রীতদাসের অবস্থায় পর্য্যবসিত দারিদ্র্যে অভিভূত ভারতবাসীদের কাছে পর্য্যন্ত তারা যখন সাহায্য চায়—তা হলে অবস্থার চাপে আমরা যদি বাইরের সাহায্য নিই, সেটা নিশ্চয়ই দোষের হবে না।

সময় সমুপস্থিত। দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্যে আমরা কিরূপ উদ্যমে অবতীর্ণ হয়েছি সে বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে সমস্ত জগৎকে —এমন কি আমাদের বিরুদ্ধপক্ষকেও জানাতে পারি। ভারতের বাইরে যেসব ভারতবাসী আছেন, বিশেষ করে পূর্ব্ব-এশিয়ায় যাঁরা আছেন, তাঁরা একটি সেনাদল গঠনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই সেনাদল ভারতে অবস্থিত বৃটিশ-বাহিনীকে আক্রমণ করার মতো শক্তিশালী হবে। যখন আমরা আক্রমণ করব, তখন বিদ্রোহের সূত্রপাত হবে। সে বিদ্রোহ শুধু ভারতের অসামরিক জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বৃটিশ-পতাকার তলে যারা এখন সংগ্রাম করছে সেই ভারতীয় সেনাদের মধ্যেও এই বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে পড়বে। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট তখন ভারতের ভিতর এবং বাহির দু-দিক থেকেই আক্রান্ত হবে। ফলে সে গবর্নমেণ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং তখন ভারতবাসীরা তাদের স্বাধীনতা ফিরে পাবে। সুতরাং আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে ভারতের সম্বন্ধে অক্ষশক্তিবর্গের মতিগতি কিরূপ তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয় না। ভারতবাসী যদি ভারতের বাইরে থেকে এবং ভিতর থেকে তাদের কর্ত্তব্য পালন করে, তবে তারাই বৃটিশদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আটত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীকে স্বাধীন করতে পারে।

আমি জানি, এমন সংশয়বাদী আছেন—যিনি বলতে পারেন, ভারতের মধ্যে থেকে আটত্রিশ কোটি ভারতবাসী যদি ভারত থেকে বৃটিশ-শক্তির উচ্ছেদ ঘটাতে না পারে, তবে বাইরে থেকে তিরিশ লক্ষ মাত্র ভারতবাসীর দ্বারা সে কাজ সম্ভব হতে পারে—এমন আশা করা চলে কি? কিন্তু বন্ধুগণ, আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস দেখুন। যদি তিরিশ লক্ষ আইরিশ বৃটিশের অধীনে সামরিক আইনের বাঁধনের মধ্যে থেকেও মাত্র বাহান্ন হাজার সশস্ত্র সিনফিন স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে গত ১৯২১ অব্দে বৃটিশ গবর্নমেণ্টকে নতজানু করে ফেলতে সমর্থ হয়ে থাকে, তবে ভারতের অভ্যন্তরে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের সাহায্য লাভ করে তিরিশ লক্ষ ভারতবাসীর পক্ষে বৃটিশকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার প্রচেষ্টা দুরাশা হবে কেন?

একথা আমি জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, ভারতের বাইরে যেসব ভারতবাসী আছেন—বিশেষ করে পূর্ব্ব-এশিয়ায়, তাঁরা তাঁদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করবেন। সেই প্রচেষ্টা সুব্যবস্থিতভাবে পরিচালনার জন্যে স্বাধীন ভারতের একটি সাময়িক গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের ইচ্ছা আমার আছে। ভারতবাসীদের সকল শক্তি পুনর্গঠিত করে ভারতস্থ বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা—এই গবর্নমেণ্টের কাজ হবে। এই প্রচেষ্টা যখন সার্থক হবে এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, এই সাময়িক গবর্নমেণ্ট তখন স্বাধীন ভারতের স্থায়ী গবর্নমেণ্টের হাতে নিজেদের কার্য্যভার ছেড়ে দেবে। ভারতবাসীদের অভিপ্রায় অনুসারেই এই স্থায়ী গবর্নমেণ্ট স্থাপিত হবে। বন্ধুগণ, এখন আপনারা বেশ বুঝতে পারছেন যে পূর্ব্ব এশিয়ার তিরিশ লক্ষ ভারতবাসীর পক্ষে তাদের সর্ব্ববিধ শক্তি, ধনবল এবং জনবল সুগঠিত করার সময় এসেছে। মনমরা ভাব নিয়ে কাজ করলে চলবে না। আমি সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তি-সংগ্রহ চাই—সব দিতে হবে, একটুও কম নয়। আমরা

বারবার আমাদের বিপক্ষপক্ষের মুখে পর্য্যন্ত একথা শুনে এসেছি যে বর্ত্তমান যুদ্ধ সামগ্রিক যুদ্ধ।

আজ আপনাদের সম্মুখে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্দেশ্যে গঠিত আজাদ-হিন্দ ফৌজের অংশবিশেষ দেখতে পাচ্ছেন। টাউন-হলের সামনে সেদিন এরা এদের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ করেছে। তারপর তারা এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে যে, পুরানো দিল্লীর লালকেল্লার সামনে গিয়ে যতদিন পর্য্যন্ত তারা বিজয়োৎসবসূচক কুচকাওয়াজ না করতে পারবে, ততদিন পর্য্যন্ত তারা সংগ্রাম থেকে নিরস্ত হবে না। 'দিল্লী চলো', 'দিল্লী চলো'— এই ধ্বনিকে তারা নিজেদের অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করেছে। বন্ধুগণ, পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী তিরিশ লক্ষ ভারতীয়ের কণ্ঠে আজ এই ধ্বনি উঠুক যে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

এই সামগ্রিক সমর-সজ্জার জন্যে আমি আশা করছি, আরও অন্ততঃ তিন লক্ষ সৈনিক এবং তিন কোটি ডলার অর্থ সংগ্রহ করতে পারব। মৃত্যুবিজয়ী একটি নারীবাহিনীর জন্যে আমি তেজস্বিনী নারীদের নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী দেখতে চাই। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁসীর রাণী যে তরবারি ধারণ করেছিলেন, বর্ত্তমান স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই নারীবাহিনী সেই তরবারি ধারণ করবেন। বন্ধুগণ, অনেকদিন থেকেই আমরা ইউরোপের দ্বিতীয় ফ্রন্ট সম্বন্ধে কত কথা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু ভারতে আমাদের দেশবাসীরা চারদিক থেকে নিষ্পিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা দ্বিতীয় ফ্রন্টের সাহায্য পাচ্ছে না। পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়েরা আমাকে ধনবল এবং জনবল দিয়ে সর্ব্বাঙ্গীন সাহায্য করুন, আমি আপনাদের দ্বিতীয় ফ্রন্ট দেখাব, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পক্ষে সেটা [illegible] ...ীয় ফ্রন্ট হবে।

সিঙ্গাপুর, ১৯৪৩ অব্দের ৯ই জুলাই

মহাত্মাজীর প্রতি

ভারতের জনগণ মহাত্মা গান্ধীর জীবনকথা ও তাঁর কার্য্যাবলীর সঙ্গে এত সুপরিচিত যে, আমাকে যদি তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর কথা আবার বলতে হয়, তবে তাদের অভিজ্ঞতার অবমাননাই করা হবে। তার পরিবর্ত্তে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে মহাত্মাজীর স্থান কোথায়, আমি শুধু তা-ই আলোচনা করব। ভারতের সেবায় এবং ভারতের স্বাধীনতা-অর্জ্জনের প্রচেষ্টায় মহাত্মা গান্ধীর অবদান এত অসামান্য ও অনুপম যে, তার জন্যে তাঁর নাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সর্ব্বযুগে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

ভারতের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর যে স্থান, তা বুঝতে হলে বৃটিশ কর্ত্তৃক ভারত-বিজয়ের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। আপনারা সকলে জানেন, বৃটিশ যখন ভারতের মাটিতে পদার্পণ করল, তখন ভারতে দুধ-ভাত ছিল সচ্ছল—ভারতের ঐশ্বর্য্যই সমুদ্রের ওপারের দারিদ্র্যপীড়িত ইংরাজদের প্রলুব্ধ করেছিল। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাজনীতিক দাসত্ব ও অর্থনীতিক শোষণের ফলে ভারতের জনগণ ক্ষুধায় ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করছে। আর যে বৃটিশ জাতি একদিন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ছিল, আজ তারা ভারতের ধনসমৃদ্ধিতে পরিপুষ্ট ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে উঠেছে। দুঃখ ও দুর্ভোগ, দীনতা ও নিপীড়নের ভিতর দিয়ে ভারতের জনগণ শেষ পর্য্যন্ত এই শিক্ষা লাভ করেছে যে, তাদের বহু রকমের সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে তাদের হারানো স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সাধন।

বৃটিশ কর্ত্তৃক ভারত-বিজয়ের উপায়গুলির কথা পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বৃটিশ ভারতের কোন অংশের সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয় নি,—তারা একেবারে সমগ্র ভারত বিজয় এবং অধিকার করতে চেষ্টাও করেনি। তারা সামরিক কার্য্যকলাপ আরম্ভ করবার আগে সর্ব্বদাই উৎকোচ ও দুর্নীতির সাহায্যে এক শ্রেণীর লোককে করায়ত্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। বাংলাতেই এই ব্যাপার ঘটেছিল। সেখানে প্রধান-সেনাপতি মীরজাফরকে বাংলার মসনদ অর্পণ করে বশীভূত করা হয়েছিল। সেই সময় ভারতে ধর্ম্মগত বা সাম্প্রদায়িক সমস্যা কারও জানা ছিল না। বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি সিরাজদ্দৌলা মুসলমান ছিলেন; তাঁর প্রধান সেনাপতি মুসলমান হয়েও তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং হিন্দু সেনাপতি মোহনলালই শেষ পর্য্যন্ত সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসের এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি যে, বিশ্বাসঘাতকতা রোধ করতে এবং তার শাস্তিবিধান করতে যদি যথাসময়ে ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তা হলে কোন জাতিই তার স্বাধীনতা রক্ষা করবার আশা করতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার এই ঘটনাচক্র যথাসময়ে ভারতীয় জনগণের চোখ ফুটিয়ে দিতে পারে নি। এমন কি সিরাজদ্দৌলার পতনের পরেও যদি ভারতের জনগণ বৃটিশের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হত, তা হলে তারা অনায়াসেই বিদেশীদের ভারতের বুক থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হত।

একথা কেউই বলতে পারবে না যে, ভারতের জনগণ তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেনি। কিন্তু তারা সকলে মিলে একতাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেনি। যখন বৃটিশ ভারত আক্রমণ করল, তখন কেউই তাদের পিছন থেকে আক্রমণ করেনি। পরে যখন বৃটিশ দক্ষিণ-ভারতে টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধরত হল, তখন মধ্য-ভারতের মারাঠারা কিংবা উত্তর-ভারতের

শিখরা—কেউই টিপুসুলতানের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয়নি। এমন কি বাংলার পতনের পরেও দক্ষিণ-ভারতের টিপুসুলতান, মধ্য-ভারতের মারাঠাগণ ও উত্তর ভারতের শিখরা সম্মিলিত হলে বৃটিশকে বিতাড়িত করা সম্ভব হত। আমাদের দুর্ভাগ্য, তা করা হয় নি। সুতরাং ভারতের এক এক অংশে এক একবার আক্রমণ করা এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র দেশে বৃটিশের প্রভুত্ব বিস্তার করা সম্ভবপর হয়েছিল। ভারতীয় ইতিহাসের এই বেদনাময় অধ্যায় থেকে আমরা শিক্ষালাভ করেছি যে, যদি শত্রুর সম্মুখে ভারতবাসীরা সম্মিলিতভাবে দণ্ডায়মান না হয়, তবে তারা কখনও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না; স্বাধীনতা অর্জন করলেও তারা তা রক্ষা করতে পারবে না।

ভারতীয় জনগণের চোখ ফুটতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। শেষ পর্য্যন্ত, ১৮৫৭ অব্দে ভারতের নানা অংশে তারা একযোগে বৃটিশকে আক্রমণ করল। সংগ্রাম আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ অনায়াসে পরাজিত হল। এই সংগ্রামকে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা "সিপাহী বিদ্রোহ" নামে অভিহিত করে; কিন্তু আমরা একে "প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম" বলে থাকি। দু'টি কারণে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের পরাজয় ঘটে। ভারতের সমস্ত অংশ এই সংগ্রামে যোগদান করেনি, আর তা ছাড়া আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষদের সামরিক দক্ষতা শত্রুর সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় ঘটনার পর ভারতের জনগণ সাময়িকভাবে হতবুদ্ধি ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। স্বাধীনতা-অর্জ্জনের সমস্ত চেষ্টা ইংরেজ তার সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে নির্ম্মমভাবে চূর্ণ করেছে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন, বৃটিশ পণ্য-বর্জ্জন, সশস্ত্র বিপ্লব,—এর কোনটির দ্বারাই স্বাধীনতা-অর্জ্জন সম্ভবপর হয়নি। আশার আর একটি আলোক-রশ্মিও অবশিষ্ট ছিল না। হৃদয়ে অবরুদ্ধ রোষ প্রজ্বলিত থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় জনগণ নূতন পদ্ধতি—স্বাধীনতা-সংগ্রামের

তন অস্ত্রের সন্ধানে ফিরছিল। এই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, অথবা আইন-অমান্য আন্দোলনের অভিনব পদ্ধতি নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। মনে হল স্বাধীনতার পথ-প্রদর্শনের জন্যে স্বয়ং ঈশ্বর যেন তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে সমগ্র জাতি তাঁর পতাকাতলে সমবেত হল। সংগ্রামের নূতন পথ পেয়ে ভারতবাসী যেন বেঁচে গেল। প্রত্যেকের মুখমণ্ডল আশা ও বিশ্বাসের আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। আবার মনে হল, ভারতের জয় সুনিশ্চিত।

কুড়ি বছর অথবা তার চেয়েও অধিককাল যাবৎ মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর সঙ্গে ভারতীয় জনগণও ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। ১৯২০ অব্দে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের নূতন অস্ত্র নিয়ে যদি আবির্ভূত না হতেন, তা হলে ভারতকে আজও হয়তো অবসাদগ্রস্ত হয়েই থাকতে হ'ত। একথার মধ্যে একটুও অতিরঞ্জন নেই। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর অবদান অপূর্ব্ব, অতুলনীয়। কোন একক ব্যক্তি এই রকম অবস্থায় এর চেয়ে বেশী কিছু কখনো করতে পারতেন না।

১৯২০ অব্দ থেকে ভারতীয় জনগণ মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে দুটি জিনিষ শিক্ষা করেছে, যা স্বাধীনতা-অর্জ্জনের সংগ্রামে অপরিহার্য্য। সর্ব্ব-প্রথমে তারা জাতীয় সম্মানবোধ ও আত্মপ্রত্যয় শিক্ষা করেছে, যার ফলে তাদের হৃদয়ে এখন বিপ্লবের অনুপ্রেরণা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে; দ্বিতীয়ত তারা দেশব্যাপী এমন একটা প্রতিষ্ঠান লাভ করেছে, যার প্রভাব ভারতের দূরতম পল্লীতেও গিয়ে পৌঁছেছে। স্বাধীনতার বাণী সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করায় সমগ্র জাতির প্রতিনিধিস্থানীয় একটা রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান তারা পেয়েছে। আজ চরম মুক্তি-সংগ্রামের—স্বাধীনতার জন্য শেষ যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত।

আধ্যাত্মিক জাগরণের ফলে কেবল যে ভারতেই স্বাধীনতা-সংগ্রাম

সূচিত হয়েছে, তা নয়। ইতালীর ‘রিসর্জিমেণ্টো’ আন্দোলনে ম্যাট্‌সিনিই প্রথম ইতালীয় জনগণকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা দান করেন। তার ফলে বীরযোদ্ধা গ্যারিবল্ডি তাঁর অনুবর্ত্তী হয়ে এক হাজার সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকের পুরোভাগে থেকে রোম অভিমুখে অভিযান সুরু করেন। আধুনিক কালের আয়ার্ল্যাণ্ডেও সিনফিনদল, ১৯০৬ অব্দে এই দলের উদ্ভবকালে, আইরিশ জনগণকে একটি কর্ম্মতালিকা প্রদান করেছিল। এই কর্ম্মতালিকার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর ১৯২০ অব্দের অসহযোগ-আন্দোলনের কর্ম্মপন্থার সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশী। সিনফিন দলের উৎপত্তিকাল থেকে দশ বছর পরে, অর্থাৎ ১৯১৬ সালে, প্রথম সশস্ত্র বিপ্লব ঘটে।

মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার সরল পথে দৃঢ়ভাবে আমাদের পরিচালনা করেছেন। তিনি ও অন্যান্য নেতৃগণ আজ কারান্তরালে বন্দিজীবন যাপন করছেন। সুতরাং মহাত্মা গান্ধী যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তা দেশের ভিতর ও বাইরে থেকে তাঁর স্বদেশবাসিদের সম্পন্ন করতে হবে। দেশের ভিতরে যে ভারতীয়েরা আছেন, শেষ-সংগ্রামের জন্য তাঁদের যা কিছু দরকার, তা তাঁদের আছে। কেবল একটি জিনিষের তাঁদের অভাব,— তা হচ্ছে মুক্তি-সেনাদল। এই মুক্তি-সেনাদল ভারতের বাইরে থেকে পাঠাতে হবে, এবং তা কেবল ভারতের বাইরে থেকেই পাঠানো যেতে পারে।

১৯২০ অব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতীয় জাতির কাছে অসহযোগ আন্দোলনের কর্ম্মপন্থা উত্থাপিত করে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—‘যদি ভারতের আজ তরবারি থাকত, তা হলে ভারত তরবারি কোষমুক্ত করত।’ এমনিভাবে যুক্তি দেখিয়ে তারপর মহাত্মাজী বলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের কথা অবান্তর বলেই, দেশবাসীর পক্ষে তার পরিবর্ত্তে অপর উপায় হচ্ছে অসহযোগ অথবা সত্যাগ্রহ। তারপর থেকে সময়ের পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং ভারতীয়

জনগণের পক্ষে এখন তরবারি কোষমুক্ত করা সম্ভবপর। আমরা এজন্য আনন্দিত ও গর্ব্বিত যে, ভারতের মুক্তি-বাহিনী সংগঠিত হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে তার সৈন্যসংখ্যা বেড়ে চলেছে। একদিকে আমাদের সেনাদলের শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করে, তাদের যত শীঘ্র সম্ভব, যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নতুন সেনাদল গঠন করে, রণক্ষেত্রের সৈন্যবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে যেতে হবে। স্বাধীনতার শেষ-যুদ্ধ দীর্ঘ এবং কঠোর হবে এবং যে পর্যন্ত ভারতে ইংরেজরা বন্দী অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত না হয়, সে পর্য্যন্ত আমাদের যুদ্ধ করে যেতে হবে। আমি আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই যে, আমাদের মুক্তি-বাহিনী আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভারতের মাটিতে পদার্পণ করার পর ইংরেজের কবল থেকে সমগ্র ভারতকে মুক্ত করতে এক বছর অথবা তারও চেয়ে বেশী সময় লাগবে। আসুন, আমরা সেজন্য উঠে পড়ে লাগি এবং দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হই।

ব্যাঙ্কক, ২রা অক্টোবর (১৯৪৩), মহাত্মা গান্ধীর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে

আজাদ-হিন্দ গবর্নমেণ্ট

স্বাধীনতা আসন্ন। আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য, একটি অস্থায়ী গবর্নমেণ্ট গঠন করা এবং সেই গবর্নমেণ্টের পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ব্রতী হওয়া। কিন্তু ভারতের প্রত্যেকটি নেতা কারাগারে, জনসাধারণও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এ অবস্থায় ভারতে অস্থায়ী গবর্নমেণ্ট সংগঠন কিংবা সে গবর্নমেণ্টের অধীনে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভব নয়। এই জন্য পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা-লীগের কর্ত্তব্য, স্বদেশ ও বিদেশের সকল দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের সমর্থনে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গবর্নমেণ্ট সংগঠন করা এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের সাহায্যে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম পরিচালনা করা।

ভারতবর্ষ থেকে বৃটেন এবং তার মিত্রদের বিতাড়িত করার জন্য অস্থায়ী গবর্নমেণ্টকে সংগ্রাম চালাতে হবে। তারপর অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হবে, স্বাধীন ভারতে জনগণের ইচ্ছানুসারে এবং তাদের বিশ্বাস ভাজন একটি স্থায়ী জাতীয় গবর্নমেণ্ট সংস্থাপন। বৃটিশ এবং তার মিত্রদের বিতাড়িত করার পর স্বাধীন ভারতে স্থায়ী জাতীয় গবর্নমেণ্ট গড়ে না ওঠা পর্য্যন্ত অস্থায়ী গবর্নমেণ্ট ভারতের জনগণের বিশ্বাস-ভাজন রূপে দেশ শাসন করবে।

ঈশ্বরের নামে, অতীত যুগে যাঁরা ভারতীয় জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের নামে, এবং যে সব পরলোকগত বীর আমাদের কাছে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তাঁদের নামে, আমরা ভারতীয় জনসাধারণকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হতে এবং

ভারতের স্বাধীনতা-লাভের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করতে আহ্বান করছি। বৃটিশের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য আমরা তাঁদের এবং তাঁদের মিত্রদের আহ্বান জানাচ্ছি। যতদিন ভারতভূমি থেকে তারা বহিষ্কৃত না হয় এবং যতদিন ভারতবাসী আবার স্বাধীন না হয়, ততদিন সাহস, অধ্যবসায় এবং চরম বিজয়ে আস্থা রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

১৭৫৭ অব্দে বাংলা দেশে বৃটিশের হাতে প্রথম পরাজয়ের পর থেকেই ভারতীয় জনসাধারণ একশ বছর অবিশ্রান্তভাবে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়েছে। এই সময়ের ইতিহাস অসংখ্য অতুলনীয় বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের আদর্শে পরিপূর্ণ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সিরাজদ্দৌলা, মোহনলাল, হায়দার আলী, টিপু সুলতান, দক্ষিণ ভারতের ভেলু তাম্পি, আপ্পা সাহেব ভোঁসলা, মহারাষ্ট্রের পেশোয়া বাজিরাও, অযোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যাম সিং আতিরিওয়ালা, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপি, দামরাওনের মহারাজ কুনওয়ার সিং, নানা সাহেব এবং আরও বহু বীরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা বুঝতে পারেন নি, বৃটিশ সমগ্র ভারত গ্রাস করতে উদ্যত। কাজেই তাঁরা সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। পরিশেষে ভারতীয় জনগণ যখন অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারল তখন তারা একত্রিত হল। ১৮৫৭ অব্দে বাহাদুর শাহের অধীনে তারা স্বাধীন জাতি হিসাবে শেষ-সংগ্রাম করল। যুদ্ধের প্রথম দিকে কয়েকবার জয়লাভ সত্ত্বেও মন্দভাগ্য এবং ভ্রান্ত নেতৃত্ব ধীরে ধীরে তাদের এনে দিল চরম পরাজয় ও পরাধীনতা। তবু ঝাঁসীর রাণী, তাঁতিয়া টোপি, কুনওয়ার সিং এবং নানা সাহেব জাতীয় আকাশে চিরন্তন নক্ষত্রের মত জ্যোতিষ্মান হয়ে আমাদের আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতার প্রেরণা দিচ্ছেন।

১৮৫৭ অব্দের পর বৃটিশরা ভারতীয়দের নিরস্ত্র করে দেয় এবং আতঙ্ক

ও পাশবিকতার রাজত্ব সৃষ্টি করে। এর পর কিছুকাল ভারতবাসীরা হতমান এবং হতবাক হয়ে ছিল। ১৮৮৫ অব্দে কংগ্রেসের জন্মের পর ভারতের নবজাগরণ সুরু হল। ১৮৮৫ অব্দ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত ভারতীয় জনগণ তাদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন, প্রচার কার্য্য, বৃটিশ-দ্রব্য বর্জ্জন, সন্ত্রাসবাদ, ধ্বংসাত্মক আন্দোলন প্রভৃতি সকল উপায়—এবং অবশেষে সশস্ত্র বিপ্লবের পথও অবলম্বন করেছে। কিন্তু সবই সাময়িকভাবে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। অবশেষে ১৯২০ অব্দে ব্যর্থতার গ্লানিতে সমাচ্ছন্ন ভারতবাসীরা যখন নতুন পথের সন্ধান করছিল, তখন মহাত্মা গান্ধী অসহযোগিতা এবং আইন অমান্য আন্দোলনের নূতন অস্ত্র নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন।

এর পর কুড়ি বৎসরকাল ভারতবাসী নানাপ্রকার দেশাত্মমূলক কাজ করছে। মুক্তির বার্ত্তা ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে পৌছেচে। ভারতবাসী শিখেছে স্বাধীনতার জন্যে নির্য্যাতন সহ্য করতে, আত্মত্যাগ করতে এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। শহর থেকে সুদূর গ্রাম অবধি জনগণ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সমবেত হল। এইভাবে ভারত শুধু রাজনৈতিক চেতনা লাভই করল না, ভারত আবার একটি অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হল। এর পর তারা একস্বরে কথা বলতে শিখল এবং এক সাধারণ লক্ষ্যের জন্যে একপ্রাণে একমনে সংগ্রাম করতে পারল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের কাজের দ্বারা ভারতীয় জনগণ প্রমাণ দিল যে তারা প্রস্তুত, নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা করার মতো ক্ষমতা তারা অর্জ্জন করেছে।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে এইভাবে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের জমি তৈরী হয়। এ যুদ্ধে জার্ম্মানী ইউরোপে বৃটিশের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। এদিকে জাপানও তার মিত্রদের সহযোগিতায় পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটিশের উপর প্রচণ্ড আঘাত করে। বিভিন্ন অবস্থার যোগাযোগে

ভারতীয় জনগণ তাদের জাতীয় মুক্তি অর্জ্জনের অভূতপূর্ব্ব সুযোগ পেয়েছে।

বিদেশে ভারতীয়গণ রাজনৈতিক চেতনা লাভ করেছে এবং একটি প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এ ঘটনা নূতন। তারা তাদের দেশবাসীর সঙ্গে সমানভাবে চিন্তাই শুধু করছে না, স্বাধীনতার পথ ধরে সমতালে এগিয়ে চলেছে। পূর্ব্ব এশিয়ায় আজ কুড়ি লক্ষেরও অধিক ভারতবাসী এক সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। তারা পূর্ণ সমরায়োজন ধ্বনিতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাদের সম্মুখে রয়েছে ভারতের আজাদী ফৌজ—তাদের মুখে এক কথা 'দিল্লী চলো'।

ভণ্ডামির দ্বারা ভারতীয়দের হতাশাচ্ছন্ন করে, লুঠ-তরাজ করে, তাদের অনাহার ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে বৃটিশ শাসকরা ভারতীয়দের শুভেচ্ছা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এখন তাদের অবস্থা বিশেষ সঙ্কটজনক। সেই অস্বস্তিকর শাসনের শেষচিহ্ন ধ্বংস করার জন্য মাত্র একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন। সেই স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির ভার আজাদী ফৌজের উপর। স্বদেশে অসামরিক জনগণের সমর্থনে এবং বিদেশে আমাদের অজেয় মিত্রবর্গের সহায়তা ও আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে ভারতীয় আজাদী ফৌজ তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করতে পারবে বলে বিশ্বাস রাখে।

পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা-লীগ আজাদ-হিন্দ ফৌজের অস্থায়ী গবর্নমেণ্ট গঠন করেছেন। এখন আমরা পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা তিনি আমাদের কাজ এবং মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে আমাদের সংগ্রামকে আশীর্ব্বাদ করুন। দেশমাতৃকার মুক্তি ও মঙ্গলের জন্যে এবং বিশ্বের দরবারে তাঁকে উন্নীত করবার জন্যে আমরা আমাদের এবং সঙ্গী সহকর্ম্মীদের জীবন পণ করছি।

অস্থায়ী গবর্নমেণ্ট প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্য দাবী করে, এবং

এই গবর্নমেণ্ট আনুগত্য লাভের যোগ্য। এই গবর্নমেণ্ট ধর্ম্মগত স্বাধীনতা এবং সমস্ত অধিবাসীর জন্যে সমান অধিকার ও সমান সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। দেশের সমস্ত সন্তানকে সমান ভাবে পালন করে এবং বিদেশী গবর্নমেণ্ট সৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার বিভেদ অতিক্রম করে সমগ্র দেশের এবং দেশের প্রতি অংশের সুখ-সমৃদ্ধি বিধানের ব্যবস্থা করতে এই গবর্নমেণ্ট দৃঢ়সংকল্প।

সিঙ্গাপুর, ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩

নেতাজী-সপ্তাহ

১৯৪৪ অব্দের ৪ঠা জুলাই থেকে ১০ই জুলাই আজাদ-হিন্দ গবর্নমেণ্টের উদ্যোগে নেতাজী-সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্ত্তী প্রসঙ্গগুলি ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত। এগুলি 'ব্লাড-বাথ' (রক্ত-স্নান) নামক স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছিল।

এক বৎসর পরে

মাতৃভূমির মুক্তি-সাধনের জন্য এক বৎসরের প্রাণপাত প্রয়াসের পর আমাদের অতীত কার্য্যকলাপের হিসাব-নিকাশ নেওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা আবশ্যক। বার মাস পূর্ব্বে পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয়দের সম্মুখে যে কার্য্যতালিকা উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তার মূল কথা ছিল 'সামগ্রিক সমর-প্রস্তুতি' (Total Mobilisation)। তখন আমি আমার দেশবাসীদের কাছে চেয়েছিলাম অফুরন্ত মানুষ, অর্থ এবং সমরোপকরণের সরবরাহ—যাতে আমরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন, বিস্তৃতি-সাধন এবং শিক্ষা-বিধানেও হাত দিয়েছিলাম।

সেই সময় আমি একথাও ঘোষণা করেছিলাম যে, আমার দেশবাসীরা যদি "সামগ্রিক সমর-প্রস্তুতির" আহ্বানে সাড়া দেন, তবে আমরা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করতে পারব। যদিও "সামগ্রিক সমর-প্রস্তুতি"র প্রস্তাব পুরোপুরি কার্য্যে পরিণত করা এখনও সম্ভব হয়নি—তবু পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়েরা আমার ডাকে সানন্দে সাড়া দিয়েছেন, একথা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি। আমি একথাও ঘোষণা করতে আনন্দ অনুভব করছি যে, আমার অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করতে পেরেছি এবং আমাদের সৈন্যেরা বর্ত্তমানে পবিত্র মাতৃভূমিতে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করছে।

এক বৎসর পূর্ব্বে আমি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাহায্যের জন্য কিছু অর্থ চেয়েছিলাম। আজ আমি গর্ব্ব এবং আনন্দের সঙ্গে বলছি, আমি যা চেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি নগদ টাকা আমি পেয়েছি। তা ছাড়া, এ পর্য্যন্ত আমরা যা সংগ্রহ করেছি, ভবিষ্যতে আমাদের প্রত্যাশিত অর্থের তুলনায় তা ভগ্নাংশ মাত্র। আমাদের অর্থ নৈতিক কর্ম্মতালিকার অঙ্গ হিসাবে আমরা ১৯৪৪-এর এপ্রিল মাসে নিজেদের একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে পেরেছি—তার নাম ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব আজাদ-হিন্দ লিমিটেড্। ব্যাঙ্কটি এরই মধ্যে এত সাফল্য লাভ করেছে যে, ইতিমধ্যেই কয়েকটি স্থানে এর শাখা-কার্য্যালয় খোলা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও খোলা হবে। ভবিষ্যতে আমরা ভারতীয় অর্থের সাহায্যে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন চালাতে পারব—এ বিষয়ে এখন আর আমার কোন সন্দেহ নেই।

নগদ টাকা দিয়ে সাহায্য করা ছাড়াও পূর্ব্ব-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল-নিবাসী ভারতীয়েরা নানা দ্রব্যাদি দিয়েও সাহায্য করছেন। তাঁদের সহৃদয়তা এবং পরিশ্রমের গুণেই সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়া থেকে আমাদের সেনাবাহিনী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে প্রয়োজনীয় সরবরাহ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এত বেশী সাড়া পাওয়া গেছে যে, যানবাহনের অসুবিধা না থাকলে সরবরাহ সংগ্রহে এ পর্য্যন্ত আমরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখানো যেত। কার্য্যত আমরা পূর্ব্ব এশিয়ার কয়েক স্থানে সরবরাহ মজুত করে রাখতে পেরেছি—এখন আবশ্যক যানবাহন পেলেই হয়। ভবিষ্যতে আমরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হব, তাদের মধ্যে একটা বড় সমস্যা হবে যানবাহন সমস্যা এবং অংশত নিজেদের চেষ্টায় এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

লোকের জন্য আমি যে আবেদন জানিয়েছিলাম, তাতেই সাড়া পাওয়া গেছে সব চেয়ে বেশী। সৈন্যদলে যোগদানের জন্যে অসংখ্য লোক এগিয়ে

এসেছে বলে সৈন্যসংগ্রহে আমাদের একটুও কষ্ট হয় নি। এপ্রসঙ্গে আমাদের একমাত্র সমস্যা ছিল কি করে যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-ব্যবস্থা করা যায়। এক বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় আমাদের সেনাদল এখন বিপুল বর্দ্ধিত-শক্তি। এর জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেও আমাকে একথা বলতে হচ্ছে যে, যারা ব্যাকুল আগ্রহে সৈন্যদলে যোগদানের জন্যে তৈরী হয়ে আছে, তাদের সবাইকে শিক্ষা-শিবিরে গ্রহণ করতে পারলে আমি আরও খুসী হতে পারতাম। পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমাদের জন্য সম্ভাব্য শিক্ষার্থী বহু আছে, প্রয়োজন হলে যে কোন মুহূর্ত্তে তাদের ডেকে আনা যাবে। কাজেই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্যপূর্ণ অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত ভবিষ্যতে আমাদের সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকবে।

আমাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব, পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয় নারী সমাজে অভূতপূর্ব্ব জাগরণ দেখা দিয়েছে এবং 'ঝাঁসীর রাণী'-বাহিনীকে যোগদানের জন্যে আমরা যে আবেদন জানিয়েছি, সে আবেদনে তাঁরা সাগ্রহে সাড়া দিয়েছেন। এই বাহিনীর যে সব দলের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে তাদের বৈপ্লবিক উৎসাহ, তৎপরতা এবং সামরিক কর্ম্মনৈপুণ্য প্রত্যেকের মনেই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। আমার মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, তাদের যখন প্রত্যক্ষ রণে প্রেরণ করা হবে তখন তারা তাদের ব্যবহার দ্বারা মাতৃভূমি তথা ভারতীয় নারী-সমাজের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করবে।

১৯৪৩এর অক্টোবর মাসে যখন আসন্ন সংগ্রামের জন্যে আমাদের প্রস্তুতি পূরো দমে চলছিল এবং আমাদের সৈন্যদল ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুবিদিত এবং অনুসৃত, 'বৈপ্লবিক' কর্ম্মপদ্ধতিসম্মত একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেটা হচ্ছে ১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর

আজাদ-হিন্দ সামরিক গবর্নমেণ্ট সংগঠন। একটি সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান রূপে এই সামরিক গবর্নমেণ্ট স্থাপিত হয়েছিল; এই গবর্নমেণ্টে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরূপে মন্ত্রী তো আছেনই, তা ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিভাগের মন্ত্রী ও উপদেষ্টারাও আছেন। জাপান, জার্ম্মানী এবং অন্য সাতটি মিত্রশক্তি আজাদ-হিন্দ সামরিক গবর্নমেণ্টকে স্বীকার করে নিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলস্থিত আমাদের বন্ধু এবং মিত্রশক্তিদের ধন্যবাদ! সামরিক গবর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বহু মিত্রশক্তি কর্তৃক তার স্বীকৃতির ফলে আমাদের নব মর্য্যাদার সৃষ্টি হয়েছে, এবং সমগ্র পৃথিবীর চোখে আমাদের সম্মান বেড়ে গেছে। মুক্তি-যুদ্ধের সৈনিকরা এর দ্বারা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছে। ১৯৪৩-এর ২৩শে অক্টোবর ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এই নবগঠিত সামরিক গবর্নমেণ্ট প্রথম উল্লেখযোগ্য পদপাত করেছিল।

নিপ্পন-গবর্নমেণ্ট কর্তৃক সামরিক গবর্নমেণ্টের স্বীকৃতির পরেই ১৯৪৩-এর ৫ই ও ৬ই নবেম্বর টোকিওতে বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার স্বাধীন জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্রষ্টা হিসাবে এই সম্মেলনে অংশ-গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে সামরিক গবর্নমেণ্ট ধন্যবাদের সঙ্গে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। এই সম্মেলন বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার স্বাধীন জাতিপুঞ্জ এবং ভারতের মধ্যে দৃঢ়সংবদ্ধ মৈত্রীভাব সংস্থাপনে সাহায্য করে। এই সম্মেলনে নিপ্পনের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো এই মর্ম্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন যে, তাঁর গবর্নমেণ্ট সামরিক আজাদ-হিন্দ গবর্নমেণ্টের হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই ঘোষণা অনুসারে আজাদ-হিন্দ ফৌজের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং সামরিক গবর্নমেণ্টের মন্ত্রী কর্নেল এ. ডি. লোকনাথনকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রথম চীফ-কমিশনার

নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৪-এর ২১শে ফেব্রুয়ারী কর্নেল লোকনাথন তাঁর নূতন কর্ম্মভার গ্রহণ করেন।

১৯৪৩-এর ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে—বিশেষ করে বৃটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে আমাদের সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সৈন্যেরা যাতে বাণী প্রচার করতে পারেন, সেই জন্য ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বেতার-কেন্দ্র নামে একটি বিশেষ বেতার-কেন্দ্র গঠিত হয়। ব্রহ্মে আমাদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হবার পর ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তের কাছে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর একটি দ্বিতীয় বেতার-কেন্দ্র খোলা হয়। সামরিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত অপর দুইটি বেতার-কেন্দ্র ছাড়াও এ দু'টি বেতার-কেন্দ্র তখন থেকেই চালু আছে।

১৯৪৩-এর শেষদিকে আমাদের সমর-প্রস্তুতি এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে, আমরা সোনান (সিঙ্গাপুর) থেকে ব্রহ্মে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সামরিক গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন অনুভব করি। ১৯৪৪-এর জানুয়ারী মাসে এই স্থানান্তরণ হয়। তখন থেকে আমরা স্বাধীন ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের সদয় সহানুভূতি ও সমর্থন পাচ্ছি এবং তার ফলে আমাদের কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে।

আমাদের সমরোদ্যোগের গতি বাড়িয়ে বৃটেন-আমেরিকার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ-ঘোষণাকে কার্য্যকরী করে তোলার জন্য ১৯৪৪-এর জানুয়ারী মাস ব্যয়িত হয়েছিল। এর পর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আরাকান অঞ্চলে আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথমারম্ভ। আরাকান অঞ্চলের যুদ্ধকে আজাদ-হিন্দ ফৌজের অগ্নি-শুদ্ধি (baptism of fire) বলা চলে। এই পরীক্ষায় আমাদের সৈন্যরা পূর্ণ বিজয়ী হয়ে এসেছে। আজাদ-হিন্দ ফৌজের সদস্যরা যে চরমতম অসুবিধা এবং কঠিন অবস্থার মধ্যেও বীরের

মতো যুদ্ধ করবে—এ বিষয়ে সকলেই এখন নিঃসংশয়। আরাকান-যুদ্ধে আমাদের যে সব সৈন্য ও অফিসার বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন তাঁদের কয়েক জনকে সামরিক গবর্নমেণ্টের তরফ থেকে সম্মানে বিভূষিত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

প্রায় একমাস পরে, সঠিক তারিখ বলতে গেলে ৮ই মার্চ্চ—ইন্দোব্রহ্ম সীমান্তের টীডিম নামক নূতন অঞ্চলে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয়। এক সপ্তাহ পরে মণিপুর ও আসামের দিকে অভিযান সুরু হল এবং অচিরে কয়েকটি স্থানে আমাদের সৈন্যরা ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করল। আজাদ-হিন্দ ফৌজের কয়েকটি দল নিপ্পনের সাম্রাজ্যিক বাহিনীর পাশাপাশি মণিপুর ও আসামে প্রবেশ করে। তারপর থেকে ভারত-সীমান্তের মধ্যে যুদ্ধ চলেছে। কালাদন এবং হাকা অঞ্চলেও আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধ করছে। যদিও সম্প্রতি আমাদের অগ্রগতি চমকপ্রদ হয়নি, তবু আমরা ধীর স্থির গতিতে এগিয়ে চলেছি। হতাহত হওয়া যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল; তার সঙ্গে জুটেছে প্রবল বর্ষা ঋতু ও আনুষঙ্গিক ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ এবং অপর বহুপ্রকারের কষ্ট ও অসুবিধা। এ সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। অপরিসীম তাদের মনোবল। ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে—এই অনুভূতি তাদের অফুরন্ত প্রেরণা জোগাচ্ছে। গৃহ রণাঙ্গণে যাঁরা কর্ম্মব্যস্ত তাদের মনেও আজ এই একই প্রেরণা।

১৯৪৪-এর মার্চ্চ মাসে আমাদের সৈন্যরা ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করার পর বিপক্ষদল পশ্চাদপসরণ সুরু করল। তখন এক নূতন সমস্যা দেখা দিল—মুক্ত অঞ্চলের শাসন ও পুনর্গঠনের সমস্যা। সুখের বিষয়, ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের পুনর্গঠন বিভাগের প্রচেষ্টায় আমরা পূর্ব্ব থেকেই এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। গত মার্চ্চে বহু নরনারী নিয়ে অন্য একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হল—তাদের কাজ,

আমাদের অগ্রসরমান সৈন্যদের সঙ্গে গিয়ে মুক্তি-প্রাপ্ত অঞ্চলের শাসন ও পুনর্গঠনের কার্য্যভার গ্রহণ। আজাদ-হিন্দ দল নামক এই প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত বেসামরিক হলেও একে সামরিক ভিত্তিতে এমন ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে—যাতে এই প্রতিষ্ঠান যুদ্ধকালীন অবস্থায় কাজ করতে পারে এবং রণক্ষেত্রের সৈন্যদেরই ন্যায় অসুবিধা ও বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। যে ভাবে বেসামরিক নরনারীরা দলে দলে এসে আজাদ-হিন্দ দলে যোগ দিয়েছে তাতে তাদের বিশেষভাবে প্রশংসা করতে হয়। এদের অনেকেই পূর্ব্বে কোন প্রকারের সামরিক শিক্ষা পায় নি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, পূর্ব্ব-এশিয়ার সমগ্র ভারতীয় সমাজের চিত্তে আত্মত্যাগের বহ্নি জ্বলছে এবং তারা স্বাধীনতা লাভের জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত। "করব অথবা মরব" এই মনোবৃত্তি শুধু আজাদ-হিন্দ ফৌজকেই অনুপ্রাণিত করছে না—বে-সামরিক ভারতীয়দের মনে মনেও আজ এই একই প্রেরণা। রণাঙ্গনের সৈন্যদের মত গৃহাঙ্গনের কর্ম্মীদের মনোবলও আজ অভূত ও অপূর্ব্ব।

আমাদের গত এক বৎসরের কাজ নিম্নোক্ত রূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করা চলে :—

১। আমরা "সামগ্রিক সমর-প্রস্তুতির" কর্ম্মতালিকা অনুসারে লোক, অর্থ এবং দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে পেরেছি।

২। আমাদের বাহিনীকে আমরা আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী করে শিক্ষিত করেছি এবং তার যথোচিত বিস্তৃতি-সাধন করেছি।

৩। সেনাবাহিনীতে আমরা "ঝাঁসীর রাণী বাহিনী" নামে একটি নারী-বিভাগ গড়ে তুলেছি।

৪। আমরা আজাদ-হিন্দ সামরিক গবর্ণমেণ্ট নামে নিজেদের গবর্ণমেণ্ট গঠন করেছি এবং মিত্রশক্তিদের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পেয়েছি।

৫। নিপ্পন-গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে আমরা স্বাধীন রাজ্যরূপে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পেয়েছি।

৬। ব্রহ্মে আমাদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র এগিয়ে এনেছি এবং ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম-সুরু করেছি। ২১শে মার্চ্চ আমরা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করতে পেরেছিলাম যে, আমাদের সৈন্যদল ভারতে পৌঁছেছে।

৭। আমরা সংবাদ ও প্রচার বিভাগের কাজ যথেষ্ট বাড়িয়েছি।

৮। আমরা স্বাধীন ভারতের শাসন ও পুনর্গঠনের কাজ গ্রহণের জন্যে "আজাদ-হিন্দ দল" নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি।

৯। আমরা ব্রহ্মে "ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব আজাদ-হিন্দ লিমিটেড" নামে আমাদের নিজেদের ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছি। আমরা নিজেদের স্বতন্ত্র মুদ্রা-নির্ম্মাণের নির্দ্দেশ দিয়েছি এবং আশা করি, অদূর-ভবিষ্যতে সে মুদ্রা আমাদের হাতে আসবে।

১০। আমরা রণাঙ্গনের প্রত্যেক অঞ্চলে নিজেদের কৃতিত্ব দেখিয়েছি এবং সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যরা ধীর স্থির ভাবে ভারতের মাটির উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা চলে—

১। রণাঙ্গনে আমাদের সাফল্য বজায় রাখতে হবে এবং ভারতের মধ্যে ক্রমাগত আরও এগিয়ে যেতে হবে। এই উদ্দেশ্যে রণাঙ্গনে অবিরত আমাদের নতুন সৈন্য ও সরবরাহ প্রেরণ করতে হবে।

২। আজাদ-হিন্দ দলকে সম্প্রসারিত করতে হবে। ভবিষ্যতে আমাদের সেনাবাহিনী যতই ভারতের মধ্যে এগিয়ে যাবে ততই আজাদ-হিন্দ দলকে আরও বেশী কার্য্যভার গ্রহণ করতে হবে। স্বাধীন ভারতের

শাসন ও পুনর্গঠনের জন্যে আমাদের পরিকল্পনা ও আয়োজনকে আরও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হবে।

৩। আমাদের গৃহ-রণাঙ্গন আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে লোক, অর্থ ও সরবরাহের আয়োজন বাড়িয়ে তুলতে হবে।

এই তিনটি প্রধান ব্যাপার সম্পন্ন করতে হলে ভবিষ্যতে নীচের সমস্যা-গুলোর দিকে আরও বেশী মনোযোগ দিতে হবে—

(ক) ভারতের মধ্যে বিপ্লব জাগিয়ে তোলা।

(খ) বিপক্ষদলীয় ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে কার্য্যকর প্রচার চালানো।

(গ) গৃহ-রণাঙ্গনের সমস্যা সমাধানের জন্যে নতুন প্রচেষ্টা—বিশেষ করে সরবরাহ ও যানবাহন ঘটিত সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা।

ভবিষ্যতের কাজ

এক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন যখন নূতন প্রেরণা লাভ করেছিল, তখন সকল কাজের গতি হয়েছিল একটি প্রধান উদ্দেশ্যমুখী। উদ্দেশ্য ছিল, স্বাধীনতা-লাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করা। সেই উদ্দেশ্য এখন পূর্ণ হয়েছে। আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করেছে এবং বর্ত্তমানে ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে।

এই নূতন পরিস্থিতি কাজের নূতন জগৎ খুলে দিয়েছে। পূর্ব্বে আমাদের কাজ পূর্ব্ব-এশিয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন অবস্থা বদলেছে। ভারতের মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলে শাসন ও পুনর্গঠন-ঘটিত নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তা ছাড়া সাফল্যের সঙ্গে যে সব সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে তার ফলেও নব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, কিভাবে ভারতের অভ্যন্তরে অভিযান চালানো যাবে, কি ভাবে দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি করা যাবে। কাজেই ভবিষ্যতে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র হবে তিনটি—প্রথম, পূর্ব্ব-এশিয়ায়; এই স্থান আমাদের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ এবং সামরিক অভিযানের ঘাঁটিরূপে থাকবে। দ্বিতীয়, মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলে; এখানে প্রধানতঃ শাসনকার্য্য এবং পুনর্গঠন-ঘটিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এবং নতুন অভিযানের জন্যে আয়োজন করতে হবে। তৃতীয়, ইংরেজ-অধিকৃত ভারতে; সেখানে বিপ্লবের সঞ্চার করতে হবে এবং আমাদের সৈন্যদলকে সেখানে প্রবেশ করতে হবে।

১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা

আন্দোলন পরিচালিত করছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ। আজাদ-হিন্দ ফৌজ ছিল তাঁদের সমর-যন্ত্র। ১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর থেকে আজাদ-হিন্দ সামরিক গবর্ণমেণ্ট স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে—কাজেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বও তারই উপর এসে পড়েছে। সেদিন পর্য্যন্ত সামরিক আজাদ-হিন্দ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সীমাবদ্ধ ছিল পূর্ব্ব-এশিয়ার মধ্যে। এখন অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক গবর্ণমেণ্টকে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং তার ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রমও বাড়াতে হবে। অন্য কথায় বলতে গেলে সামরিক গবর্ণমেণ্টকে তিনটি কার্য্যক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে—পূর্ব্ব-এশিয়া, মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চল এবং ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষ। সেইজন্য সামরিক গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাদের জন্যে এই তিনটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করে দিতে হবে। এক দলের কার্য্যক্ষেত্র হবে পূর্ব্ব-এশিয়া, অপর দলের মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চল, এবং তৃতীয় দলের ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষ। পূর্ব্ব-এশিয়ায় কর্ম্মরত প্রথম দলকে বলা হবে মন্ত্রীমণ্ডলের পূর্ব্ব-এশিয়া কমিটি, মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলে কর্ম্মরত দ্বিতীয় দলকে বলা হবে মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চল কমিটি, আর তৃতীয় দলের নামকরণ হবে যুদ্ধ কমিটি।

ভবিষ্যতে পূর্ব্ব-এশিয়ায় লোক, অর্থ এবং দ্রব্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে আরও বেশী উৎসাহ ও শক্তি নিয়োগ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ মন্ত্রী-বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে অথবা বর্ত্তমান বিভাগের সম্প্রসারণ করতে হবে—যাতে এই সব সমস্যার সহজে সমাধান হয়। বর্ত্তমান অর্থ-সচিবের বিভাগকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং তাঁর কার্য্যক্ষেত্রের সীমান্ত বাড়াতে হবে। বিভিন্ন কাজের জন্য আরও বহু নরনারী সংগ্রহ এবং তাদের শিক্ষাবিধানের জন্যে জনশক্তির মন্ত্রিবিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগের সৃষ্টি করতে হবে। আজাদ-হিন্দ ফৌজ, ঝাঁসীর রাণী বাহিনী, আজাদ-হিন্দ দল এবং ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের দৈনন্দিন কাজের জন্যে

এই সব নরনারীর প্রয়োজন। সম্প্রতি যে সরবরাহ-মন্ত্রিবিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে তারও বিস্তৃতি-সাধন করতে হবে। যে সব মন্ত্রিবিভাগ আছে এবং ভবিষ্যতে যে গুলির সৃষ্টি করা হবে, তাদের কাজ তারা অবশ্যই করবে কিন্তু ভবিষ্যতে প্রধান দায়িত্ব পড়বে অর্থ, জনশক্তি এবং সরবরাহ বিভাগের উপর। মন্ত্রিমণ্ডলের পূর্ব্ব-এশিয়া কমিটি পূর্ব্ব-এশিয়ায় কাজ চালানোর জন্যে দায়ী থাকবেন; সেই সব মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে, যাঁরা সাধারণত পূর্ব্ব-এশিয়ায় কাজ করবেন।

ভারতের মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলের শাসন ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ইতিপূর্ব্বেই তৈরী করা হয়েছে এবং সুযোগ আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো কার্য্যকরী করা হবে। এই উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ দলের প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারীদের রাখা হয়েছে এবং আজাদ-হিন্দ দলের সদস্যরা ইতিমধ্যেই ভারতের অভ্যন্তরে কিংবা ভারত-সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। সেই সব মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাকে নিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চল কমিটি গড়ে তোলা হবে, যাঁদের উপর মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলের কার্য্যভার দেওয়া হয়েছে, কিংবা যাঁরা সেই সময় মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলে থাকবেন। মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতে কার্য্য-পরিচালনার জন্যে মন্ত্রিমণ্ডলের মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চল কমিটি দায়ী থাকবেন।

মন্ত্রিমণ্ডলের যুদ্ধ-কমিটি গঠিত হবে সেই সব মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের নিয়ে যাঁরা ইংরেজ-অধিকৃত ভারতে সামরিক অভিযান চালনা সম্পর্কিত ব্যবস্থা এবং প্রচার, বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ, শাসন এবং পুনর্গঠন সম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন।

পরিবর্ত্তিত অবস্থার দাবী মেটানোর জন্য উল্লিখিত উপায়ে মন্ত্রিমণ্ডলকে তিন ভাগে বিভক্ত করতে হবে। এ সত্ত্বেও গবর্নমেণ্টের ঐক্য বজায় রাখতে হবে—যাতে সর্ব্বাধিক ফল লাভের উদ্দেশ্যে এবং প্রধান লক্ষ্য অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে তিনটি কমিটির কার্য্য কেন্দ্রীভূত এবং তাদের মধ্যে সমন্বয়-বিধান হয়।

বিশ্ব-পরিস্থিতি

আমি যে চোখে বর্ত্তমান সাধারণ পরিস্থিতি দেখছি তারই সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করব। সর্ব্বপ্রথম আমি বলতে চাই, আমি পরিপূর্ণ আশাবাদিতা নিয়ে সাধারণ পরিস্থিতি দেখে থাকি এবং আমার এ আশাবাদিতার কারণও প্রকাশ করে বলতে পারি। প্রথম কারণ, পূর্ণ একবৎসর ধরে কাজ করে আমরা নিজের চোখেই নিজেদের কৃতিত্ব দেখতে পেয়েছি এবং ভবিষ্যতে আমরা অরও কত কি করতে পারি সে সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট ধারণা দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়রা সম্পূর্ণতঃই আমাদের সঙ্গে আছেন এবং "সামগ্রিক সমর প্রস্তুতির" কার্য্যতালিকা বাস্তবে পরিণত করতে তাঁরা আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

সেই সঙ্গে আর একটি ঘটনা আছে। আমরা সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি—আমরা ভারত-সীমান্ত পার হয়ে গেছি এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিপক্ষদলকে পরাজিত করতে পেরেছি। এমন এক সময় ছিল যখন লোকে সন্দেহ করত—ভারতীয় জাতীয় বাহিনী প্রকৃতই প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারবে কিনা এবং যদিই বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় তবে বিপক্ষদলকে পরাজিত করতে পারবে কিনা। আমরা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি; অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে আমরা বিপুল আত্মবিশ্বাস লাভ করেছি।

ভারতের মাটিতে লড়াই সুরু হবার পর থেকে এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। "যুদ্ধ আমাদেরই"—এই অনুভূতি শুধু যে প্রত্যক্ষ

সংগ্রামরত সৈন্যদের মনে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করেছে তা নয়—যারা রণাঙ্গণের পিছনে আছে তাদের মনেও নব বীর্য্য দান করেছে। সমালোচকরা হয়ত বলতে পারেন, বিগত কয়েক সপ্তাহে আমাদের অগ্রগতি এমন কিছু দর্শনীয় হয় নি ;—কিন্তু এতে আমরা বিচলিত নই। গত আগষ্টে আমি প্রথম বলি, শীঘ্রই আমরা ভারতের দিকে অভিযান আরম্ভ করতে পারব। তার পর থেকে আমি পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের বিশেষ করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের পুনঃ পুনঃ বলে আসছি ভারত সীমান্ত অতিক্রম করার পরই আমাদের সব চেয়ে কঠিন যুদ্ধ করতে হবে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতির পর, এবং প্রত্যাসন্ন দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামের সম্পর্কে আমার দেশবাসী ও সৈন্যদের বার বার সাবধান করে দেবার পর, বিপক্ষদের প্রবল প্রতিরোধ উপলব্ধি করে বিস্মিত হব কেন? বিপক্ষদল যা করছে, তা আমাদের প্রত্যাশানুযায়ীই হয়েছে। এখন যা ঘটছে আমরা তারই অপেক্ষা করেছিলাম। অতএব ভারতমুখী অভিযান আরম্ভ করার সময়ে আমাদের যে আশাবাদিতা ছিল, এখনও তা ঠিক পূর্ব্বের মতই সজীব ও প্রোজ্জ্বল আছে।

আমাদের সৈন্যরা অনেক অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু সে সম্বন্ধে তাদের কাছ থেকে কোন অভিযোগ আমি পাইনি। সৈন্যরা এ পর্য্যন্ত একটি মাত্র অভিযোগ করেছে—সে অভিযোগ এসেছে যখন তাদের সম্মুখ রণাঙ্গণে পাঠাতে বিলম্ব হয়েছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সম্প্রতি আমি একটি হাসপাতাল পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। সেইখানে আহত, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগগ্রস্ত সৈন্যরা আছে। সেরে ওঠা মাত্র তাদের রণাঙ্গণে ফিরে পাঠানোর জন্য তারা আমার কাছে অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করল। এরাই সম্মুখ রণাঙ্গণে যুদ্ধ করেছে, সেখানকার অবস্থা আগাগোড়া জানে তবু তারা খুব হাসি খুসী এবং পুরোপুরি আশাবাদী। কোনরূপ অত্যুক্তি না করে আমি বলতে পারি পূর্ব্ব-এশিয়ার সকল

ভারতীয়ের মনই এইরূপ অফুরন্ত আশাবাদিতায় ভরা। বিপক্ষদলের এই দৃঢ় প্রতিরোধ যে আমাদের টলাতে পারে নি—তার আরও একটা কারণ আছে। তারা যদি মণিপুর, পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসাম হারায়, তবে ব্রহ্মপুত্র নদে পৌছানোর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাদের পক্ষে আর বাধা দান সম্ভব হবে না। নদের অপর পারে গিয়ে তবেই তারা বাধা দান করতে পারবে। কাজেই, সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করেই তারা কথিত অঞ্চলে সর্ব্ব শক্তিবিনিয়োগ করবে। এই জন্যেই তাদের পক্ষে যতটা সম্ভব দৃঢ় প্রতিরোধ দেওয়া খুবই স্বাভাবিক।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের বলিষ্ঠ আশাবাদিতা তিনটি কারণের ফল; প্রথমতঃ গত এক বছরে আমরা অসামান্য ফললাভ করেছি; দ্বিতীয়তঃ, আমরা ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় মাটির উপর বিপক্ষসেনাদের পরাজিত করতে পেরেছি, এবং তৃতীয়তঃ, বর্ত্তমান রণাঙ্গণের বিরাট সামরিক গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করেছি; এর ফলে আমরা অনুভব করছি, এ অঞ্চল অধিকার করার জন্য আমাদের সুকঠিন সংগ্রাম করতে হবে।

বিশ্বপরিস্থিতি এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করলে তবে এই আশাবাদী মনোভাব আরও দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। বিশ্বপরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যাবে, বিপক্ষীয়েরা পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গণে পূর্ণরূপে কর্ম্মব্যস্ত। ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণের আরম্ভও পরোক্ষভাবে আমাদের সহায়ক—কেননা তার অর্থ, দীর্ঘ কালের জন্যে ইঙ্গ-মার্কিণ সমর শক্তি ইউরোপে সম্পূর্ণ কর্ম্মব্যস্ত থাকবে।

আমরা ভারতীয়রা বিশ্বপরিস্থিতি বিচার করে দেখলে বুঝতে পারব, স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছানোর পক্ষে এর চেয়ে অধিকতর অনুকূল ঘটনা-সমাবেশ আর হতে পারে না—এখানে-ওখানে কোন রণাঙ্গণে অক্ষশক্তির বিপদ দেখা দিলেও, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। আমাদের

পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে, বিপক্ষীয়েরা সকল রণাঙ্গণে পূর্ণব্যস্ত এবং তার ফলে আমরা ভারতীয় জনসাধারণ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা লাভের স্বুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। মাঝে মাঝে আমাকে এমন সব প্রশ্ন করা হয়, যে আমি হাসি রোধ করতে পারিনে। যেমন ধরুন, সেদিন আমায় প্রশ্ন করা হয়েছিল, রোম অধিকৃত হওয়ায় আমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আমি বলেছিলাম, ভারতের যুদ্ধের উপর এর কিছু মাত্র প্রভাব নেই। বিপক্ষীয়েরা এমন গভীরভাবে ব্যস্ত যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতে যে সব সাহায্য প্রেরণ করা হত সে সব সাহায্য সে ইউরোপের বিভিন্ন রণাঙ্গণে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই অক্ষশক্তিরা কোন কোন রণাঙ্গণে পরাজয় স্বীকার করলেও, আমাদের দিক থেকে অন্ততঃ তাতে বিশ্বপরিস্থিতির অদল বদল হয় না। সেদিন আমায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—শত্রুরা শেরবুর্গ দখল করায় আমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আমি ঐ একই উত্তর দিয়েছিলাম। আমাদের কাছে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, ভারতে আমাদের বিরুদ্ধে যে সব ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য নিয়োজিত হত, তারা এখন ইউরোপে যুদ্ধ করছে, এবং তারা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছে। আমি জার্ম্মাণ-শক্তি বেশ ভাল ভাবে জানি এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস, ইঙ্গ-মার্কিণরা ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হবে। ব্যর্থ ইউরোপীয় অভিযানে ইঙ্গ-মার্কিণদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি সহ্য করতে হবে।

আমাদের আশাবাদিতার বৃদ্ধির পক্ষে আর একটি কারণও আছে—সেটা ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা। এ পর্য্যন্ত কংগ্রেস ও বৃটিশ গবর্নমেণ্টের মধ্যে কোন আপোষ রফা হয় নি। কিছুকাল পূর্ব্বে সহসা মহাত্মা গান্ধীকে যখন মুক্তি দেওয়া হয়, তখন অনেকে জল্পনা করছিল—একি নিছক গান্ধীজির ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ, না এ মুক্তি আপোষের ভূমিকা বিশেষ। এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অসুস্থতার জন্যই মহাত্মা গান্ধীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—এর পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। যতদিন

পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধী এবং বৃটিশ গবর্নমেণ্টের মধ্যে আপোষ না হচ্ছে, ততদিন আমাদের উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। আর ওদিকে যাই হোক, যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে এবং মহাত্মা গান্ধী যদি আপোষ করেনও, তবু আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব। এবিষয়ে সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের সঙ্গে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আপোষরফা না হলে আমাদের এদিককার প্রচেষ্টা কিছু কম হলেও চলবে, এবং আমাদের কাজ হয়ে উঠবে অনেক পরিমাণে সহজ। এপর্য্যন্ত আপোষের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এবং আমাদের পক্ষে সব চেয়ে উৎসাহজনক ব্যাপার এই, এপর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধী যেসব বিবৃতি দিয়েছেন, তার মূল বক্তব্য একই। তিনি বলেছেন, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাবের উদ্যোক্তা হিসাবে তিনি যে মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন, সে মনোভাব পরিবর্ত্তনের কোন কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। অতএব এ অবস্থায় কংগ্রেস এবং বৃটিশ গবর্নমেণ্টের মধ্যে আপোষের কোন সম্ভাবনাই নেই, এবং ফলে আমাদের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের উপায় এখন দেখা যাচ্ছে একটি—সে উপায় যুদ্ধ করা। যাঁরা একদিন অহিংস সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করবেন বলে আশা করেছিলেন তাঁরা আজ বুঝতে পারছেন, শক্তি প্রকাশ না করতে পারলে, তারা কখনও ভারতীয় দাবীর কাছে মাথা নত করবে না। কাজেই জনগণ যদি স্বাধীন হতে চায়, তবে তাদের এগিয়ে আসতে হবে, এ সংগ্রামকে সমর্থন করতে হবে।

আর একটা প্রশ্ন সকলের মনে জাগছে—কংগ্রেসের সঙ্গে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের আপোষের সম্ভাবনা আছে কিনা। আমার মতে এ প্রশ্নের উত্তর—এইতত্ত্বের দিক থেকে আপোষরফার সম্ভাবনা সর্ব্বদাই আছে। বাস্তব বিচারে আপোষ প্রায় অসম্ভব। আমি যখন বলি যে তত্ত্বের দিক থেকে কংগ্রেস এবং বৃটিশ গবর্নমেণ্টের আপোষ সম্ভব, তখন

আমি বোঝাতে চাই যে বৃটিশ গবর্নমেণ্টে যদি সত্য সত্যই আপোষরফা করে, তাহলে তারাই জিতবে, ভারতীয় জনসাধারণ হারবে। আজকে শুধু একটি ভিত্তিতেই আপোষ সম্ভব—অর্থাৎ ভারতীয় জনগণের একটি গবর্নমেণ্ট গঠন করতে হবে এবং যুদ্ধে বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে সে গবর্নমেণ্টকে সহযোগিতা করতে হবে। এই ভিত্তিতে বৃটিশরা আপোষ করতে পারে এবং করলে তাদের লাভ হবে এবং আমাদের হবে ক্ষতি। কাজেই তত্ত্বের দিক থেকে আপোষরফা সম্ভব এবং সে আপোষ বৃটিশদের পক্ষেই সুবিধাজনক।

বাস্তব বিচারে কিন্তু আপোষরফা প্রায় অসম্ভব—কেননা বৃটিশরা ভারতীয় জনসাধারণের হাতে গবর্নমেণ্ট তুলে দিতে যাবে না। এমন কয়েকজন ভারতীয় নেতা আছেন যাঁরা প্রকৃত ভারতীয় গবর্নমেণ্ট গঠন করতে পারলে আপোষরফা করে বৃটেনের যুদ্ধে সহযোগিতা করতে রাজী। কিন্তু বৃটিশরা ভারতীয় জনসাধারণকে বিশ্বাস করে তাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না—কেননা বৃটেনের সব সময় সন্দেহ, ক্ষমতা হাতে পেয়ে ভারতীয়রা যদি সাহায্য করতে অস্বীকার করে? কাজেই বাস্তব আপোষরফা প্রায় অসম্ভব।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার মতে আপোষরফার কোন সম্ভাবনা নেই। একমাত্র যে প্রশ্ন বাকী থাকে—সেটা হচ্ছে, মহাত্মা গান্ধী কিংবা অন্য কোন প্রধান কংগ্রেস নেতা বৃটিশ গবর্নমেণ্টের কাছে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করে "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবেন কিনা। এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর মনোভাবে দুর্ব্বলতার সামান্য লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। তাঁর বার্দ্ধক্য এবং চরম দুর্ব্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছুমাত্র দুর্ব্বলতার লক্ষণ নেই। অপর পক্ষে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের যেসব পত্রালাপ হয়েছিল, তারা সে সব প্রকাশ করার জন্যে অতিমাত্রায় উৎসুক। আমার মতে এর অর্থ,

মহাত্মা গান্ধীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করার জন্যে তারা ভারত এবং অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রের জনসাধারণকে প্রস্তুত রাখতে চায়। ১৯৪২এর আগষ্ট মাসে গান্ধীকে কারাগারে প্রেরণের পর ওরা কতকগুলো দলিলপত্র প্রকাশ করে জনসাধারণকে বোঝাতে চেয়েছিল, গান্ধীজীর মনোভাবে আপোষ এবং মিলনের স্থান নেই। এই পত্রালাপ প্রকাশিত করেও তারা জনগণকে বোঝাতে চায়, তাঁকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া বৃটিশ গবর্নমেণ্টের গত্যন্তর ছিল না ; কাজেই প্রকাশিত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে আমি বিবেচনা করি মহাত্মা গান্ধী কিংবা অন্য কোন কংগ্রেস নেতা বিনাসর্ত্তে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন—এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই। ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের পক্ষে পরম অনুকূল—এই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কংগ্রেস যতদিন আপোষ না করছেন এবং বিনাসর্ত্তে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের কাছে আত্মসমর্পণ না করছেন ততদিন জনসাধারণের মনোভাব থাকবে বৃটিশ-বিরোধী। আমাদের অভিযান যত অগ্রসর হবে, জনগণও ততই বুঝতে পারবে, স্বাধীনতা লাভের এই হচ্ছে উপায়। তারা হয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে, নয়ত আমাদের যুদ্ধ-পরিচালনায় সাহায্য করবে।

পূর্ব্ব-এশিয়া ও অন্যান্য রণক্ষেত্রে আমাদের কৃতিত্ব, অনুকূল বিশ্ব-পরিস্থিতি ও ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা—এই সব মিলে আমাদের মনে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে প্রচুর আশা এবং আশাবাদের সঞ্চার করছে।

জাতীয় বাহিনী

এক বৎসর পূর্ব্বে এই দিনটিতে শোনান থেকে (Syonan) আমি বিশ্বের সামনে সগৌরবে ঘোষণা করেছিলাম, আজাদ হিন্দ ফৌজ জন্মগ্রহণ করেছে। আমার পক্ষে সেদিনটি ছিল পরম গৌরবের। তার কারণ, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের সার্থকতা উপলব্ধি করি। অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছিল, ভারতের সীমার মধ্যে জাতীয় বাহিনী সংগঠন অসম্ভব। অনিচ্ছুক হাত থেকে শুধু অস্ত্রের সাহায্যেই স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া যায় এ সম্বন্ধে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায়। বৃটিশরা যেখানে শত্রু বিবেচিত হয় এমন কোন দেশেই শুধু জাতীয় বাহিনী গঠন সম্ভব, একথা আমি বুঝতে পারি। তাই আমাদের স্বাধীনতা লাভের সকল আশা নির্ভর করছিল একটি বিশ্বসংগ্রামের উপর। কাজেই ১৯৩৯ অব্দে বর্ত্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত আমাদের কাছে রাত্রিশেষের বার্ত্তা বয়ে এনেছিল। শেষ পর্য্যন্ত ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধ যখন পূর্ব্ব-এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল, যখন নিপ্পনের অজেয় শক্তির বলে পূর্ব্ব-এশিয়া থেকে ইঙ্গ- মার্কিণ শক্তি ও প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে গেল, তখন ভারতীয় জনগণের সম্মুখে বহুযুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের অপূর্ব্ব সুযোগ এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব-এশিয়ার অধিবাসী তিরিশ লক্ষ ভারতীয়ের মনে জাগল নতুন চেতনা। তাঁরা অচিরে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ বা আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ নামে নিজেদের রাজনৈতিক দিক থেকে সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ব্যবস্থাও করা হল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন আমাদের বিপক্ষদলের পক্ষে বিষম আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তারা কিছুকাল এর অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যখন সংবাদ আর চেপে রাখা গেল না, তখন তারা নয়া-দিল্লীর ভারত-বিরোধী বেতার কেন্দ্রের মারফৎ এই মর্ম্মে প্রচার স্থরু করল যে, জাপানের নিয়ন্ত্রণাধীনে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা জাপানী সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ প্রচারও বেশী দিন কার্য্যকরী হল না—কারণ ভারতে নানাসূত্রে সংবাদ যেতে লাগল যে, পূর্ব্ব-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু অসামরিক ভারতবাসী আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিচ্ছে। ভারত-বিরোধী রেডিওর বিশেষজ্ঞদেরও প্রচার-কৌশল পালটাতে হল। তারা তখন এই মর্ম্মে নতুন প্রচার স্থরু করল, ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে অস্বীকৃত হয়েছে বলেই বেসামরিক ভারতীয়দের যোগ দিতে বাধ্য করানো হয়েছে। দিল্লীর সবজান্তাদের মাথায় এ বুদ্ধি জোগায় নি যে, যুদ্ধ-বন্দীদের উপর বলপ্রয়োগ করে যদি তাদের সেনা-বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য না করা যায়, তবে স্বাধীন বেসামরিক অধিবাসীদের জোর করে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করানো আরও কঠিন। কিন্তু আমাদের বিপক্ষীয় প্রচারকদের এরূপ মূর্খতা বিস্ময়কর নয়—নিজের বিবেক যদি দুষ্ট হয় কিংবা কোন দুর্ব্বল বিষয়কে যদি সমর্থন করতে হয়, তবে পরস্পর-বিরোধী যুক্তি না দিয়ে উপায় থাকে না। যাই হোক, আজ আমি ঘোষণা করছি যে, বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব সদস্য এবং পূর্ব্ব-এশিয়ার অসামরিক ভারতীয়দের নিয়ে ভারতের মুক্তি-ফৌজ গঠিত হয়েছে।

যার সামান্য সাধারণ বুদ্ধি আছে সেও বুঝবে, জোর করে ভাড়াটে বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হলেও জোর করে স্বেচ্ছাসৈনিকদের বাহিনী গড়ে তোলা যায় না। কোন লোকের ঘাড়ে আপনি জোর

করে রাইফেল চাপিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু যে আদর্শ তার নিজের নয় তার জন্তে আপনি তাকে প্রাণ দিতে বাধ্য করাতে পারেন না।

আজাদ-হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্তরা আজ দক্ষিণে আরাকান থেকে উত্তরে আসাম পর্য্যন্ত দীর্ঘ রণাঙ্গনে বীরের মতো লড়াই করছে এবং প্রাণ দিচ্ছে। আজ পৃথিবীর কেউ বিশ্বাস করবে না যে, এই বাহিনীটি বলপ্রয়োগ করে তৈরী করা হয়েছে। কাজেই বিপক্ষীয় প্রচারকদের নতুন প্রচার-কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে—সে প্রচার শুধু গালাগালিতে ভর্ত্তি। কিন্তু গালাগালি তো সর্ব্বদাই হতাশার সম্বল। একেবারে গোড়ার দিকে আমাদের শত্রুরা বলত যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ আদপে কোন বাহিনীই নয়—শুধু মিথ্যা প্রতারণা; এ বাহিনী কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যাবে না। পরে দিল্লীর ভারত-বিরোধী বেতার চীৎকার করতে সুরু করল, নির্দ্ধারিত সময়ক্রম অনুসারে আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করেনি। এখন যখন আমরা ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করেছি এবং ভারতের মাটিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছে, তখন বিপক্ষীয় প্রচারকরা হতাশ হয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখছে। আমরা দিল্লীতে প্রবেশের তারিখ নির্দ্ধারণ করেছিলাম বলে তারা কাল্পনিক তারিখ আবিষ্কার করেছে, এবং আমাদের দিল্লী-প্রবেশের এই সব কাল্পনিক তারিখ আবিষ্কার করে, নির্দ্ধারিত সময়ানুসারে আমাদের দিল্লীতে না পৌছানোর জন্তে গালাগালি করছে। আমি স্বীকার করি যে, ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করতে আমাদের কিছু বিলম্ব হয়েছে; কিন্তু তাছাড়া গত বারো মাস যাবত নির্দ্ধারিত সময়-তালিকা অনুসারেই আমাদের কাজ হয়ে এসেছে। এখন আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, ভবিষ্যতেও আমরা নির্দ্ধারিত সময়-তালিকা অনুসারেই কাজ করে যাব।

গত আগষ্ট মাস থেকেই আমি আমার দেশবাসীদের সর্ব্বদা

মনে করিয়ে দিয়েছি যে, ভারত-সীমান্ত অতিক্রমের পরই প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হবে; সে যুদ্ধ হবে কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী। আমি তাঁদের আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, ভারতের মাটিতেই বৃটিশরা প্রথম এবং শেষবারের মতো পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করবে। কারণ তারা জানে যে, ভারত হাত-ছাড়া হওয়া মানেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যু। কাজেই আমরা দীর্ঘ এবং কঠিন যুদ্ধের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দিল্লী অভিযান খুব সহজ হবে না। এযুদ্ধ হবে ইতিহাসের অন্যতম কঠিন যুদ্ধ—তবে শেষ বিজয়লাভ করব আমরাই। নয়া দিল্লীতে বড়লাটের প্রাসাদের উপর ত্রিবর্ণ-পতাকা উড্ডীন দেখার পূর্ব্বে আমাদের যদি আরও বারো মাস কিংবা চব্বিশ মাস পর্যন্তও যুদ্ধ করতে হয়, তবু বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

আমি ইতিপূর্ব্বেই বলেছি, সেনাবাহিনীর লোক এবং অসামরিক অধিবাসীদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়েছে। এ বাহিনী শুধু পুরুষদের নিয়েই গঠিত নয়, এ বাহিনীতে নারী-সৈন্যও আছে। আজ ভারতের অভ্যন্তরে আমাদের বাহিনীর পুরুষরাই লড়াই করছে—কিন্তু এমন দিন শীঘ্রই আসবে যখন আমাদের নারী-সৈনিকরা, ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর আমাদের কমরেডরা—পুরুষদের সঙ্গে পাশাপাশি রণাঙ্গণে যাবে। আমাদের বাহিনীতে নতুন সৈন্য সংগ্রহেরও অভাব নেই। কার্য্যত সুরু থেকেই এত নতুন সৈন্য আসতে সুরু করেছে যে, আমরা তাদের সবারের শিক্ষা-ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। এবং আমি যতদূর দেখতে পাই, তাতে মনে হয় যে যুদ্ধ যতদিন থাকবে, ততদিন এই রকম নতুন সৈন্য বহু সংখ্যায় আসতে থাকবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ শুধু ভারতীয়দের দ্বারা গঠিতই নয়—এ বাহিনীকে শিক্ষাও দিয়েছে ভারতীয়রা। সেই বাহিনী আজ ভারতীয় অফিসারদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে ভারতে আমাদের বিপক্ষীয়েরা যে সব মিথ্যা রটনা করেছে, তার কিছু কিছু আমি জানি:



বিশ্রাম মুহূর্তে ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী

কিন্তু ভারতীয় জনগণ ভারতের মাটিতে যখন নিজ চোখেই তাদের দেখতে পাবে, তখন তারা বিস্মিত হয়ে যাবে।

আমি আজাদ-হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে অন্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে এই, যদিও কোন কোন অত্যাবশ্যক ব্যাপারে আমরা জাপানী গবর্নমেণ্ট এবং সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতে বাধ্য হই, তবু আজাদ-হিন্দ ফৌজ প্রধানতঃ ভারতীয়দের অর্থ এবং সামর্থ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট এবং গঠিত। গতবৎসর আমি পূর্ব্ব-এশিয়ার স্বদেশবাসীদের কাছে যে অর্থ দাবী করেছিলাম, পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী। এখনও প্রচুর পরিমাণে অর্থ আসছে এবং যতদিন আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম শেষ না হবে ততদিন এই রকম আসতে থাকবে। শুধু তাই নয়, সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়া থেকে ভারতীয় বণিক-সম্প্রদায় এবং ব্যবসায়ীরা আমাদের সেনাদলের জন্যে প্রচুর দ্রব্য সরবরাহ করছেন। অতএব ভারতীয় জনগণের এখন নিজেদের সেনাবাহিনী আছে—সে বাহিনী ভারতীয়দের দ্বারা সংগঠিত, ভারতীয় অর্থ-সামর্থ্যে পরিপুষ্ট, ভারতীয়দের দ্বারা শিক্ষিত এবং ভারতীয় অফিসারদের নেতৃত্বে যুদ্ধরত। এখন শুধু ভারত থেকে শেষ বৃটিশটিকে বিতাড়িত না করতে পারা পর্য্যন্ত দুর্দ্দম শৌর্য্যে এবং অনমনীয় দৃঢ় সঙ্কল্পে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

উপসংহারে আমি বলতে চাই, আজাদ-হিন্দ ফৌজ সহায়বিহীন প্রতিষ্ঠান নয়। এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে আছে পূর্ব্ব-এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসী যারা ভারতীয় প্রচেষ্টায় ভারত স্বাধীন করার জন্যে সামগ্রিক সমর-সজ্জার কর্ম্ম-তালিকা অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাছাড়া, আজাদ-হিন্দ ফৌজের সংবাদবাহক এবং চরেরা ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এবং সেখানে নীরবে কাজ করে চলেছে—যাতে আমাদের সামরিক অভিযানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সমগ্র দেশব্যাপী বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে। এই ভাবে পূর্ব্ব-এশিয়ার দূরতম কোণ থেকে

ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত আমরা একটি রণাঙ্গনের সৃষ্টি করেছি—ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় রণাঙ্গণ।

আমাদের অফিসার ও সৈন্যদের সর্ব্ববাদী-সম্মত ইচ্ছায় আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরবের বিষয় হয়েছে। আজাদ-হিন্দ ফৌজ সাময়িক আজাদ-হিন্দ গবর্নমেণ্টের সামরিক মুখপাত্র। সামরিক গবর্নমেণ্ট এবং তার সেনাবাহিনী ভারতীয় জাতির ভৃত্য মাত্র। তাদের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ করে ভারতকে মুক্ত করা। যখন সে মুক্তি সাধন হয়ে যাবে, তখন ভারতীয় জনগণ ইচ্ছানুযায়ী তাদের গবর্নমেণ্টের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করবে। সাময়িক গবর্নমেণ্ট তখন স্বাধীন ভারতের স্থায়ী গবর্নমেণ্টের জন্যে স্থান করে দেবে। এই স্থায়ী গবর্নমেণ্ট ভারতীয় জনগণের ইচ্ছানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই গৌরবময় দিনের প্রতীক্ষায় আমরা আজ স্বেদসিক্ত শ্রম ও যুদ্ধে নিযুক্ত।

বেতার বক্তৃতা : আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনের প্রথম বার্ষিকী

পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধ এখন আমাদেরই

ব্রহ্মের আরাকান অঞ্চলে ১৯৪৪-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম সুরু হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক দিনটিতে আজাদ-হিন্দ ফৌজের কয়েকটি দল অভিযান আরম্ভ করেছিল। ইতিহাসে আরাকান-যুদ্ধ বড় ঘটনা না হলেও আমাদের পক্ষে দুইটি কারণে এ যুদ্ধের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। প্রথমতঃ, আরাকানেই শত্রুর বিরুদ্ধেআমাদের প্রথম অভিযান সুরু হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ এই আরাকান যুদ্ধেই আমাদের সৈন্যরা প্রথম "অগ্নি-শুদ্ধি" (Baptism of fire) লাভ করেছিল। এই প্রথম পরীক্ষায় তারা সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে ভবিষ্যতে আজাদ-হিন্দ ফৌজের অবশিষ্টাংশের অনুসরণযোগ্য নতুন আদর্শ স্থাপন করেছে। এই সব কারণে, যে সব অফিসার ও সৈন্য আরাকান-অভিযানে বীরের মতো যুদ্ধ করে মাতৃভূমির মর্য্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, তাঁদের কাছে আজাদ-হিন্দ ফৌজ চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

২২শে মার্চ্চ আমাদের আরাকান-অভিযানের সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর এল. এম. মিশ্রকে সাহস এবং কর্ম্ম-নিপুণ নেতৃত্বের জন্যে "সর্দ্দার-ই-জঙ্গ" পদক দিয়ে সম্মানিত করার ব্যক্তিগত সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তারপর, আজাদ-হিন্দ ফৌজের অন্যান্য অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে যাঁরা বীরত্ব ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের সামরিক সম্মান ঘোষণা করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। লেঃ পিয়ারা সিং এঁদের অন্যতম ; তিনি আজ এখানে উপস্থিত আছেন।

এই অফিসারটি আজাদ-হিন্দ ফৌজের সদস্যদের পক্ষে আদর্শ-স্থানীয় ; তিনি সমগ্র অভিযানে অপূর্ব্ব স্বদেশ প্রেম, সাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়ে আমাদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। ১৯৪৪ এর ৫ই ফেব্রুয়ারী বিপক্ষদলের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি অভূতপূর্ব্ব সাহস, বুদ্ধি এবং কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়েছিলেন। এই কৃতিত্বের জন্য তাঁকে ব্যক্তিগত সাহসের পরিসূচক প্রথম শ্রেণীর পদক "বীর-এ-হিন্দ" দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারীর এই ঘটনার পর ১৬ই ফেব্রুয়ারী এবং ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারীর অপর দুইটি সংঘর্ষেও লেঃ পিয়ারা সিং কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। শেষের সংঘর্ষটিতে তিনি ট্রেঞ্চ মর্টারের (এক প্রকারের ক্ষুদে কামান) গুলিতে আহত হয়েছিলেন ; তাঁর দুটি পা-ই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিছুকাল তাঁর অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁকে রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে আনতে হয়েছিল। বর্ত্তমানে আমাদের হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে এবং আমি সানন্দে আপনাদের জানাচ্ছি যে, তাঁর অবস্থা এখন অনেকটা ভাল।

আজ আমি লেঃ পিয়ারা সিংকে পদক দিয়ে বিভূষিত করছি ; এই পদক তিনি নিজের রক্ত দিয়ে অর্জ্জন করেছেন এবং তিনি এ পদকের যোগ্যতম অধিকারী। এ রকম সাহসী অফিসারকে সম্মানিত করে আমি নিজেকে, আমার সেনাবাহিনীকে এবং আমার গবর্নমেণ্টকে সম্মানিত করছি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের সেনাদলের মনোবল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আরাকান-অভিযানের পর ইন্দোব্রহ্ম-সীমান্তের অন্য কয়েকটি অঞ্চলে—বিশেষ করে হাকা, টিড্ডিম এবং কালাদন অঞ্চলে যুদ্ধ সুরু হয়েছিল। তারপরই গত মার্চ্চের মাঝামাঝি এসেছিল গৌরবময় মুহূর্ত্ত, যখন আমাদের সাহসী সেনাবাহিনী নিপ্পন-বাহিনীর পাশাপাশি ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করে মণিপুর এবং আসামে প্রবেশ করে।

সেই থেকে আমাদের সেনাবাহিনী মাতৃভূমির পবিত্র মাটিতে বিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সীমান্ত অতিক্রমের ফলে আমাদের সেনা-দলের মনে অপূর্ব্ব প্রেরণা এসেছে। পূর্ব্ব-এশিয়ায় ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে নিপ্পনের যুদ্ধ রূপে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল—সে যুদ্ধ এখন আমাদের যুদ্ধ, ভারতের মুক্তির যুদ্ধ। কাজেই, কোন কষ্ট কোন অসুবিধা কোন স্বার্থত্যাগেই আমাদের কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। এ শুধু আমাদের স্বাধীনতার মূল্য। বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভের পরে আমরা নিপ্পনের সাম্রাজ্যিক-বাহিনীর কাছ থেকে কয়েকবার অভিনন্দন বাণী পেয়েছি। এ রকম প্রত্যেক বাণীতে ভবিষ্যতে আমাদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধির সংকল্প দৃঢ়তর হয়েছে, এবং বীরত্ব ও সাহসের উচ্চতর শিখরে আরোহণের প্রবৃত্তি জেগেছে। আমি পুনরায় নিশ্চিত করে বলছি যে, এ যুদ্ধ আমাদের জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ; এর মধ্যে যত যন্ত্রণা-ভোগ ও আত্মত্যাগের দাবীই থাকুক না কেন, চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত আছি বলে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ়-সংকল্প।

ব্রহ্ম গবর্নমেণ্ট এবং সাম্রাজ্যিক নিপ্পন-বাহিনীর মাননীয় প্রতিনিধিরা তাঁদের উপস্থিতির দ্বারা বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন বলে আমি তাঁদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের সাধারণ বিজয় লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁদের সেনাদলের সঙ্গে এবং তাঁদের জাতির সঙ্গে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাব।

সম্মান-দান উৎসবের কুচ-কাওয়াজ উপলক্ষে : ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৪

মহাত্মা গান্ধীকে

মহাত্মাজী,

এখন আপনার স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছে; আপনি কিছু পরিমাণে সাধারণের কাজে মনোনিবেশ করতে পারছেন। তাই আমি আপনাকে ভারতের বহির্ব্বর্ত্তী স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়দের কার্য্যকলাপ এবং পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলার অনুমতি চাইছি। কথা কয়টি বলার পূর্ব্বে, ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুন আপনার আকস্মিক কারা-মুক্তির পর সারা পৃথিবীর ভারতীয়দের মনে যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল—সেই সংবাদ আপনাকে জানাতে চাই। বৃটিশ কারাগারে শ্রীমতী কস্তুর বাঈজীর শোচনীয় দেহাবসানের পর, আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্বদেশবাসীর উদ্বিগ্ন হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। যাই হোক, ঈশ্বর দয়া করে আপনাকে সুস্থ করে তুলেছেন যাতে আমার দেশের আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ লোক আপনার উপদেশ ও নির্দ্দেশের সুযোগ লাভ করতে পারে।

আপনার সম্বন্ধে ভারতের বহির্ব্বর্ত্তী ভারতবাসীদের মনোভাব কি, সে সম্বন্ধে আমি এরপর কিছু বলতে চাই। এই প্রসঙ্গে আমি যা বলব তা একেবারে খাঁটি সত্য। দেশের মতো ভারতের বাইরেও এমন অনেক ভারতবাসী আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, কেবল সংগ্রামের ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারেই ভারতের স্বাধীনতা-লাভ সম্ভব। এই সব নরনারী বাস্তবিক অনুভব করেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কখনও অনুনয় কিংবা নৈতিক চাপ কিংবা অহিংস প্রতিরোধের কাছে আত্মসমর্পণ

করবে না। তা সত্ত্বেও, দেশের মত বিদেশী ভারতীয়দের মধ্যেও পথের বিভিন্নতা আছে। ১৯২৯-এর ডিসেম্বর মাসে আপনার উদ্যোগে লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা-প্রস্তাব ওঠার পর থেকে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সমস্ত সদস্যের সম্মুখে সাধারণ লক্ষ্য একটি। বিদেশ-প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে আপনি হচ্ছেন আমাদের দেশের বর্ত্তমান গণ-চেতনার স্রষ্টা। পৃথিবীর সামনে তাঁদের প্রচার-কার্য্যে তাঁরা আপনাকে আপনার প্রাপ্য সকল মর্য্যাদাই দেন। বিশ্বের জন-সাধারণের কাছে আমরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এক—আমাদের জীবনের লক্ষ্য এক, আকাঙ্ক্ষা এক এবং কর্ম্মোদ্যোগও এক। ১৯৪১-এ ভারত ত্যাগের পর বৃটিশ প্রভাব-মুক্ত যে সব দেশে আমি ঘুরেছি, সে সব দেশে আপনাকে সবাই এত শ্রদ্ধা করে যে, গত এক শত বৎসরের মধ্যে আর কোন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা সেরূপ শ্রদ্ধা পান নি। প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি আছে, এবং রাজনৈতিক সমস্যাকে বিচার করার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কিন্তু এর ফলে যে মানুষটি এত ভালভাবে তাঁর জাতির সেবা করেছেন এবং সাহসিকতার সঙ্গে সারাজীবন একটি প্রথম শ্রেণীর আধুনিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তাঁর গুণ-বিচারে কিছুমাত্র তারতম্য হয় না। কার্য্যতঃ যে সব দেশ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বন্ধু বলে ভাণ করে, সে সব দেশের চেয়ে যে সব দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্য-বিরোধী, সেই সব দেশেই আপনার মূল্য এবং কৃতিত্বের মূল্য দেওয়া হয় বেশী। ভারত বহির্ব্বর্ত্তী স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়রা এবং ভারতের স্বাধীনতার বিদেশী বন্ধুরা আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন; আর সেই শ্রদ্ধা শত গুণে বেড়ে গিয়েছিল যখন ১৯৪২-এর আগষ্ট মাসে আপনি বীরের মতো "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

আমি যখন ভারতে ছিলাম তখনকার অভিজ্ঞতা থেকে—ভারতের

বাইরে এসে ব্রিটেনের নীতি সম্বন্ধে আমি যে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছি তার থেকে—এবং সমগ্র পৃথিবীতে ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের যে চিত্র আমি দেখেছি তার থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট কখনও ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করে নেবে না। এই যুদ্ধ-জয়ের প্রচেষ্টায় আজ ভারতকে পুরোপুরি শোষণ করাই বৃটেনের একমাত্র চেষ্টা। এই যুদ্ধে বৃটেন তার সাম্রাজ্যের একাংশ হারিয়েছে শত্রুদের কাছে, অপরাংশ হারিয়েছে মিত্রদের কাছে। এ যুদ্ধে কোনপ্রকারে মিত্রশক্তি যদি জয়লাভ করেও, তবে ভবিষ্যতে বৃটেন নয়—আমেরিকাই হবে বেশী শক্তিশালী রাষ্ট্র। তার অর্থ, বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষিত রাজ্যে পরিণত হবে। এই পরিস্থিতিতে বৃটেন পূর্ব্বের চেয়েও বেশী নিদারুণ ভাবে ভারত শোষণ করে তার ক্ষতি পরিপূরণ করার চেষ্টা করবে। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে চিরদিনের মতো ধ্বংস করার পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে গেছে। আমি গোপন অথচ নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এই সব পরিকল্পনার কথা জেনেছি বলেই এসম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি কর্ত্তব্য বলে মনে করি। আমাদের পক্ষে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট এবং বৃটিশ জনগণকে ভিন্ন করে দেখা মারাত্মক ভুল হবে। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের মতো বৃটেনেও ক্ষুদ্র একদল আদর্শবাদী আছেন—যাঁরা ভারতকে স্বাধীন দেখতে চান। এই সব আদর্শবাদীকে তাঁদের দেশের লোকেরা মনে করে পাগল ; এঁদের সংখ্যাও নগণ্য। ভারতের ব্যাপারে বাস্তব দিক থেকে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট এবং বৃটিশ জনসাধারণ সমানার্থবোধক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি বলতে পারি, ওয়াশিংটনের শাসক-গোষ্ঠী এখন বিশ্ব-প্রভুত্বের স্বপ্ন দেখছেন। এই শাসক-গোষ্ঠী এবং তাঁদের বুদ্ধিবাদী টীকাকাররা খোলাখুলি "মার্কিণ শতাব্দী"র কথা বলেন ; অর্থাৎ বর্ত্তমান শতাব্দীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বে প্রভুত্ব করবে। এই শাসক-

গোষ্ঠীতে আবার এমন চরমপন্থীও আছেন যাঁরা বৃটেনকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম ষ্টেট বলে থাকেন।

আপনি সারাজীবন যে পথের বার্ত্তা প্রচার করে আসছেন, সেই পথে—বিনা নররক্তপাতে যদি ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হত, তবে স্বদেশে কিংবা বিদেশে এমন কোন ভারতবাসী নেই যে সুখী হত না। কিন্তু বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা যদি স্বাধীনতা চাই, তবে আমাদের রক্তস্নানের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ভারতে থেকে যদি নিজে চেষ্টায় এবং উপাদানে সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত, তবে সেটাই হত সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু মহাত্মাজী, ভারতের অবস্থা আপনি আর সকলের চেয়ে ভাল করেই জানেন। আমার কথা বলতে গেলে, ভারতে বিশ বৎসরের জন-সেবার অভিজ্ঞতার পর আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, বাইরের সাহায্য—বিদেশস্থ ভারতীয়দের সাহায্য এবং কোন একটি বা একাধিক বিদেশী শক্তির সাহায্য ছাড়া ভারতে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠন অসম্ভব। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য—এমনকি বিদেশস্থ ভারতীয়দের সাহায্য পাওয়াও অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভ বৃটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুদের কাছ থেকে রাজনৈতিক এবং সামরিক এই উভয়বিধ সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল। তাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করার পূর্ব্বে আমাকে প্রথম জানার চেষ্টা করতে হয়েছিল, ভারতের স্বাধীনতা-দাবীর প্রতি তাদের যথার্থ মনোভাব কি। কয়েক বৎসর ধরে বৃটিশ প্রচারকরা বিশ্ববাসীদের জানাচ্ছিল অক্ষশক্তিগুলি স্বাধীনতার শত্রু এবং কাজে কাজেই ভারতের স্বাধীনতারও শত্রু। সে কথা কি সত্য? আমি নিজেই নিজেকে এ প্রশ্ন করেছিলাম। কাজেই এই সত্যানুসন্ধানের জন্যে এবং আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে অক্ষশক্তিপুঞ্জ আমাদের সাহায্য ও

সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত কিনা—জানার উদ্দেশ্যে আমাকে ভারত ছেড়ে আসতে হয়েছিল।

কিন্তু গৃহ এবং দেশত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে, বিদেশ থেকে সাহায্য নেওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে কিনা—এ প্রশ্নের মীমাংসা আমাকে করতে হয়েছিল। কি কি উপায়ে অন্যান্য জাতি স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেই সব জানার জন্যে আমি ইতিপূর্ব্বে সারা পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাস পড়েছিলাম। আমি এমন একটি দৃষ্টান্তও পাই নি যেখানে কোন না কোন প্রকারের বিদেশী সাহায্য ছাড়া দাস জাতির স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়েছে। ১৯৪০ অব্দে আমি আবার গভীর ঐকান্তিকতার সঙ্গে ইতিহাস পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, কোন না কোন প্রকারের বিদেশী সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতা লাভের উদাহরণ ইতিহাসে নেই। সাহায্য নেওয়া সঙ্গত কিনা—এই নৈতিক প্রশ্ন সম্পর্কে নিজের মনকে বুঝিয়েছিলাম, ব্যক্তিগত জীবনের মতো রাষ্ট্রীয় জীবনেও ঋণ হিসাবে সাহায্য নেওয়া চলে এবং পরে সে ঋণ শোধ দেওয়া চলে। তাছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের মত শক্তিশালী সাম্রাজ্য যদি ভিক্ষার পাত্র হাতে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে পারে, তবে আমাদের মতো কৃতদাস এবং নিরস্ত্র জাতির পক্ষে বিদেশ থেকে ঋণ হিসাবে সাহায্য নেওয়ায় কি আপত্তি থাকতে পারে? মহাত্মাজী, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলতে পারি, এই বিপজ্জনক পথে পা বাড়ানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে আমি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস এর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেছি। এতদিন পর্য্যন্ত যথাশক্তি আমার দেশবাসীর সেবা করে পরিণামে বিশ্বাস-ঘাতক হবার কিংবা আমাকে বিশ্বাস-ঘাতক বলে অভিহিত করার কোন সুযোগ কাউকে দেবার ইচ্ছা আমার কখনও হতে পারে না।

দেশে বসে পূর্ব্বের মতো কাজ করে যাওয়া ছিল আমার পক্ষে

সহজতম উপায়। যুদ্ধকালের জন্য কোন ভারতীয় কারাগারে বন্দী হয়ে থাকাও আমার পক্ষে সহজ ছিল। তার ফলে ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষতি হত না। দেশবাসীর উদারতা এবং স্নেহকে ধন্যবাদ—ভারতীয় কোন জন-সেবকের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সম্মান, তাঁরা তাই আমাকে দিয়েছিলেন। একটি রাজনৈনিক দলও আমি গড়েছিলাম; সেই দলে আমার যাঁরা একনিষ্ঠ এবং অনুগত সহকর্ম্মী, তাঁদের গভীর বিশ্বাস ছিল আমার উপরে। বিপজ্জনক সন্ধানে বিদেশে গিয়ে যে আমি শুধু আমার প্রাণ এবং সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনকে বিপদগ্রস্ত করছিলাম তাই নয়, আমার রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎকেও বিপন্ন করছিলাম। বিদেশে না গিয়েও আমরা স্বাধীনতা পেতে পারি—এরকম ক্ষীণতম আশা যদি মনে পেতাম, সঙ্কট-মুহূর্ত্তে আমি কখনও ভারত ছেড়ে আসতাম না। আমার জীবিতকালে স্বাধীনতা-লাভের জন্য বর্ত্তমান যুদ্ধের মতো আর একটি সুযোগ—আর একটি সুবর্ণসুযোগ পাব, এরূপ কোন আশা যদি আমার মনে থাকত, আমি গৃহত্যাগ করে আসতাম না। দুটি বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল; প্রথমতঃ আগামী এক শতাব্দীর মধ্যে আর এরূপ সুবর্ণসুযোগ আসবে না,— দ্বিতীয়তঃ, বিদেশ থেকে চেষ্টা না করলে শুধু দেশে বসে নিজেদের চেষ্টায় আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারব না। সেই জন্যেই আমি বিপদে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ইতস্তত করিনি।

ঈশ্বর আমার প্রতি সদয়। নানা রকম অসুবিধা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত আমার সব পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে। ভারত থেকে বেরিয়ে আসার পর বিদেশে যেখানেই দেশবাসীদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, সেখানেই তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা আমার কাজ হল। আমি সানন্দে জানাচ্ছি সর্ব্বত্রই আমি তাদের পূর্ণ-সচেতন দেখেছি—ভারতের স্বাধীনতার জন্যে তারা সম্ভবপর সব কিছু করতে প্রস্তুত। মিত্র পক্ষীয়দের সঙ্গে সংগ্রামরত গবর্নমেণ্টগুলির

ভারত সম্বন্ধে মনোভাব কি জানার জন্যে আমি তাদের সংস্পর্শে এলাম। দেখলাম, গত কয়েক বৎসর যাবৎ বৃটিশ প্রচারকরা যা আমাদের বলছিল, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা—অক্ষ-শক্তিপুঞ্জ এখন খোলাখুলি ভাবেই ভারতের স্বাধীনতার বন্ধু। আমি আরও আবিষ্কার করলাম, আমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং তাদের সামর্থ্যানুযায়ী তারা আমাদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত।

আমি জানি, আমাদের বিপক্ষদল আমার বিরুদ্ধে কি প্রচার-কার্য্য চালাচ্ছে! কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে আমার দেশবাসীরা আমাকে ভালভাবে জানেন; তাঁরা বিপক্ষীয়দের ফাঁদে পা দেবেন না। যে লোক জাতীয় আত্মমর্য্যাদা এবং গৌরবের জন্যে সারা জীবন সংগ্রাম করেছে ও দুঃখ-ভোগ করেছে, সে কখনও কোন বিদেশী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। তা ছাড়া ব্যক্তিগত দিক থেকেও বিদেশী শক্তির দ্বারা আমার লাভবান হবার কোন সম্ভাবনা নেই। ভারতবাসীর পক্ষে যা পাওয়া সম্ভব, দেশবাসীদের কাছ থেকে সেই শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়ে, বিদেশী শক্তির কাছ থেকে আমার পাওয়ার আর কি থাকতে পারে? সেই ধরণের লোকই শুধু পুতুল হয়ে থাকতে পারে যার কোন গৌরব-বোধ কিংবা আত্মসম্মান-বোধ নেই—যে অন্যের প্রভাবে নিজের জন্য পদ-মর্য্যাদা গড়ে তুলতে চায়।

আমার সব চেয়ে বড় শত্রুও আমার বিরুদ্ধে একথা বলার সাহস রাখে না যে, আমি জাতীয় গৌরব এবং আত্মসম্মান বিক্রয় করতে পারি। আমার সব চেয়ে বড় শত্রুও বলতে সাহস পাবে না যে, আমার দেশে আমি নগণ্য ব্যক্তি ছিলাম এবং আমার নিজের পদমর্য্যাদা সৃষ্টির জন্যে বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। ভারতবর্ষ ছেড়ে আমার নিজের জীবন এবং আমার যা কিছু—সবই বিপন্ন করতে হয়েছিল। আমাকে যে এই বিপদের সম্মুখীন হতে হল, তার কারণ,

কেবলমাত্র এই ভাবেই আমার দ্বারা ভারতের মুক্তি-সাধনে সাহায্য করা সম্ভব ছিল।

অক্ষ-শক্তি সম্বন্ধে এখন শুধু আমার একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাকী আছে। আমি তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি—এটা কি সম্ভব? আমার বিশ্বাস একথা সকলেই স্বীকার করবে, বৃটিশদের মধ্যেই সব চেয়ে বুদ্ধিমান ও সুকৌশলী রাজনীতিবিদ্ পাওয়া যায়। যে লোক সারা জীবন বৃটিশ রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে—তার পক্ষে পৃথিবীর অন্য কোন রাজনীতিকের দ্বারা প্রতারিত হওয়া সম্ভব নয়। বৃটিশ রাজনীতিবিদরাই যদি আমাকে তোয়াজ করে কিংবা বল-প্রয়োগ করে বাধ্য করতে না পেরে থাকেন, অন্য কোন রাজনীতিবিদই তা পারবেন না। বৃটিশ গবর্নমেণ্টের হাতে আমি দীর্ঘ কারাভোগ অত্যাচার এবং শারীরিক নির্য্যাতন সহ্য করেছি; তারাই যদি আমার নৈতিক অধঃপতন না ঘটাতে পেরে থাকে তবে অন্য কোন শক্তিই তা পারতে পারে না। তাছাড়া, আপনি ব্যক্তিগত ভাবে জানেন যে, আমি আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলী গভীর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতাম। এ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে আমি আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র-নেতাদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলাম। কাজেই রাজনীতির খেলায় আমি এমন শিশু নই যে, কোন চতুর সুকৌশলী রাজ-নীতিবিদ্ আমাকে প্রতারিত করে যাবে। সর্ব্বশেষ হলেও এটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে অক্ষ-শক্তিপুঞ্জের মনোভাব সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির এমন সব বড় বড় নেতা ও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শ স্থাপন করেছিলাম, যাঁরা তাঁদের জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনাবলীর নিয়ামক। কাজেই আমি সাহসের সঙ্গে এ কথা বলতে পারি, দেশবাসীরা আমার আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর বিচারের উপর পূর্ণতম আস্থা স্থাপন করতে

পারেন। বিদেশস্থ ভারতীয়েরা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবেন যে, আমি দেশত্যাগের পর এমন কোন কাজ করি নি যার ফলে কোন প্রকারে আমার দেশের গৌরব আত্মসম্মান কিংবা স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে। আমি যা কিছু করেছি, তা আমার জাতীর মঙ্গলের জন্তে, বিশ্বের সামনে ভারতের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্তে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এগিয়ে দেবার জন্তে করেছি।

মহাত্মাজী, পূর্ব্ব-এশিয়ায় যুদ্ধারম্ভের গোড়া থেকে বিরুদ্ধ দল জাপানের বিরুদ্ধে প্রবল এবং বিধ্বংসী প্রচারকার্য্য চালাচ্ছে। কাজেই আমি জাপান সম্বন্ধে কিছু বলব—বিশেষ করে এই কারণে যে বর্ত্তমানে আমি জাপানী গবর্নমেণ্ট সেনাবাহিনী এবং জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করছি। এমন এক সময় ছিল, যখন জাপানের সঙ্গে ব্রিটিশদের মিত্রতা ছিল। যতদিন পর্য্যন্ত ইঙ্গ-জাপ মৈত্রী বজায় ছিল, ততদিন আমি জাপানে আসিনি। যতদিন পর্য্যন্ত দুটি দেশের মধ্যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, ততদিন আমি জাপানে আসিনি। জাপান তার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করার পরে—বৃটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করার পরে—আমি স্বেচ্ছায় জাপান পরিদর্শন করতে মনস্থ করেছিলাম। আমার দেশের অন্যান্য অনেক লোকের মতোই কয়েক বৎসর ধরে আমি জাপবিরোধী প্রচার-কার্য্য করেছিলাম। আমার দেশের অন্যান্য অনেক লোকের মতোই আমিও বুঝতে পারতাম না, ১৯৩৭ অব্দে জাপান হঠাৎ চীন আক্রমণ করে বসল কেন? এবং আমার দেশের অন্যান্য লোকের মতো ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ অব্দে আমার সহানুভূতি ছিল চুংকিং-এর প্রতি। আপনার হয়তো স্মরণ আছে, কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর মাসে আমিই চুংকিং-এ চিকিৎসক-বিমান পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু জাপান পরিদর্শনের পরে আমি যা বুঝতে পেরেছি এবং আমাদের দেশের

অনেকেই এখনও যা বুঝতে পারছেন না, সেটা হচ্ছে এই যে পূর্ব্ব-এশিয়ায় যুদ্ধারম্ভের পর থেকে সাধারণ ভাবে পৃথিবী সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে এশিয়ার জাতিপুঞ্জ সম্বন্ধে জাপানের মনোভাবে পরিপূর্ণ বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন এসেছে। শুধু যে জাপানী গবর্ণমেণ্টেরই এ পরিবর্ত্তন হয়েছে তা নয়, জাপানী জনগণেরও হয়েছে। জাপানী জনগণের মনে এসেছে নতুন চেতনা। বর্ত্তমানে ফিলিপাইন ব্রহ্ম এবং ভারত সম্বন্ধে জাপানের যে মনোভাব, তার মূলে আছে এই পরিবর্ত্তন। চীনেও জাপানের নতুন নীতির মূলে এই একই জিনিষ। জাপান পরিদর্শনের পরে এবং বর্ত্তমান জাপানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের পরে আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে, এশিয়া সম্বন্ধে জাপানের বর্ত্তমান নীতি ধাপ্পাবাজি নয়—এর মূলে আছে আন্তরিকতা। সমগ্র জাতির মনে নতুন চেতনা সঞ্চারিত হবার উদাহরণ ইতিহাসে এই প্রথম নয়। ইতিপূর্ব্বে ফরাসী-বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে এবং বলশেভিক-বিপ্লবের সময় রাশিয়ায় আমরা এর সাক্ষাৎ পেয়েছি। ১৯৪৩-এর নবেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার জাপান পরিদর্শনের পর আমি ফিলিপাইন পরিদর্শন করেছিলাম, ফিলিপিনো নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং নিজের চোখে সব কিছু দেখেছিলাম। আমি ব্রহ্মে কিছুকাল ধরে আছি এবং স্বাধীনতা-ঘোষণার পর সে দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়েছি। জাপানের নতুন নীতি প্রকৃত, না নিছক ধাপ্পাবাজি—তা দেখবার জন্য আমি চীনেও গিয়েছিলাম। জাপান এবং চীনের জাতীয় গবর্নমেণ্টের মধ্যে সর্ব্বশেষ চুক্তির ফলে চীনের জনসাধারণ যা যা দাবী করেছিল কার্য্যতঃ তার সব কিছুই তারা পেয়েছে। এই চুক্তিতে জাপান যুদ্ধশেষে চীন থেকে তার সৈন্যদল সরিয়ে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। চুংকিং-চীন যুদ্ধ করছে কেন? কেউ কি বিশ্বাস করতে পারে, বৃটেন আমেরিকা নিছক পরোপকার-প্রবৃত্তি থেকেই চুংকিং-চীনকে সাহায্য

করেছে? চুংকিংকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর জন্যে বৃটেন ও আমেরিকা এখন যে সাহায্য করছে, তার বদলে তারা কি প্রতিদান চাইবে না? আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জাপানের প্রতি অতীত ঘৃণা ও বিদ্বেষের দরুন চুংকিং নিজেকে বৃটেন ও আমেরিকার কাছে বন্ধক দিচ্ছে। যতদিন পর্য্যন্ত চীনের প্রতি জাপান তার বর্ত্তমান নীতির প্রবর্ত্তন করে নি, ততদিন পর্য্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে বৃটিশ ও মার্কিণ সাহায্য চাইবার পিছনে তবু কিছুটা যুক্তি ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে চীন-জাপানের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হওয়ায় চুংকিং-এর পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে অর্থহীন সংগ্রাম চালানো কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। এটা চীনের জনগণের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—এশিয়ার পক্ষেও মঙ্গলজনক নয়। ১৯৪২-এর এপ্রিল মাসে আপনি বলেছিলেন, আপনার যদি স্বাধীনতা থাকত তবে আপনি চীন এবং জাপানের মধ্যে একটা বোঝা-পড়ার চেষ্টা করতেন। আপনার সে উক্তি ছিল, দুর্লভ রাজনীতিবোধের পরিচায়ক। চীনের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলার দরুন মূলতঃ ভারতের দাসত্বই দায়ী। ভারতের উপর বৃটিশ আধিপত্য আছে বলেই ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদ্বয় ধাপ্পা দিয়ে চুংকিংকে আশা দিল যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর জন্যে চীনে যথেষ্ট সাহায্য আমদানী করা সম্ভব। মহাত্মাজী, আপনি ঠিকই ভেবেছিলেন, স্বাধীন ভারত জাপান এবং চীনের মধ্যে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করত। আমি বলতে চাই, ভারত স্বাধীনতা পেলে চুংকিং বর্ত্তমানে যে মূর্খতা করছে সে সম্বন্ধে তার চোখ খুলে যাবে, এবং তার ফলে চুংকিং ও জাপানের মধ্যে একটা সম্মানজনক আপোষরফা হবে। আমি পূর্ব্ব-এশিয়ায় আসার পর থেকে এবং চীন-পরিদর্শনের পর থেকে, আমি চীনের সমস্যা আরও গভীর ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি। আমি দেখছি, চুংকিং-এ এক-নায়কত্বের শাসন চলছে। যদি ন্যায়সঙ্গত কারণে হয়, তা হলে ব্যক্তিগত ভাবে আমার এক-নায়কত্বের

বিরুদ্ধে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু চুংকিং-এ যে এক-নায়কত্ব বিরাজমান তার উপর বিদেশী মার্কিণ-প্রভাব সুস্পষ্ট। দুঃখের বিষয়, ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদ্বয় চুংকিং-এর শাসক-গোষ্ঠীকে এই বলে প্রতারিত করতে পেরেছে যে, কোন প্রকারে জাপানকে যদি পরাজিত করা যায়, তবে এশিয়ায় চীনই হবে প্রধান শক্তি। আসল ব্যাপার কিন্তু এই, জাপান যদি কোন-ক্রমে পরাজিত হয় তবে চীন সম্পূর্ণ আমেরিকান প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাবে। সেটা চীনের পক্ষেও যেমন করুণ হবে, সমগ্র এশিয়ার পক্ষেও তেমনই করুণ হবে। জাপানের পরাজয়ের পর এশিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হবার মিথ্যা আশায় চুংকিং-এর শাসকগোষ্ঠী হোয়াইট হাউস এবং হোয়াইট হলের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে অপবিত্র মৈত্রীবন্ধনে বাঁধা পড়েছে। ভারতে চুংকিং গবর্ণমেণ্ট যে প্রচারকার্য্য চালায় এবং ভারতীয়দের হৃদয়াবেগে নাড়া দিয়ে যে ভাবে তাদের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করে তার কিছু কিছু সংবাদ আমি রাখি। কিন্তু ওয়াল ষ্ট্রীট এবং লম্বার্ড ষ্ট্রীটের কাছে যে চুংকিং নিজেকে বন্ধক রেখেছে, সে আর ভারতীয় জনগণের সহানুভূতি পাবার যোগ্য নয়—বিশেষ করে চীনের প্রতি জাপানের নতুন নীতি প্রবর্ত্তনের পরে।

মহাত্মাজী, ভারতীয় জনগণ মৌখিক প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে কত গভীর-ভাবে সন্দিহান, সকলের চেয়ে আপনিই সেকথা জানেন বেশী ভাল করে। জাপানের নীতি-ঘোষণা যদি নিছক প্রতিশ্রুতিমাত্র হত, তবে আমি কিছুতেই জাপানের দ্বারা প্রভাবিত হতাম না। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি, কিভাবে এই বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও জাপান ফিলিপাইন ব্রহ্ম এবং জাতীয় চীনের মতো দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধন করেছে। জাপানের যিনি নেতা ও প্রধান মন্ত্রী সেই জেনারেল তোজো প্রতিটি কথার মর্য্যাদা রক্ষা করেন ও তাঁর ঘোষণার সঙ্গে কাজের পরিপূর্ণ সঙ্গতি বিদ্যমান। নৈতিক বিচারে জাপানের

এই জাতীয় নেতা সমসাময়িক রাষ্ট্রনায়কদের সকলের চেয়ে বহুগুণে বড়।

ভারত প্রসঙ্গে এসে আমি একথা বলতে বাধ্য, জাপান তার কাজের দ্বারা ঐকান্তিকতার প্রমাণ দিয়েছে। এমন এক সময় ছিল, যখন লোকে বলত ভারত সম্বন্ধে জাপানের স্বার্থপর অভিপ্রায় আছে। তার যদি স্বার্থের অভিপ্রায়ই থাকত, তবে সে স্বাধীন-ভারতের সাময়িক গবর্নমেণ্টকে স্বীকার করে নিত কি? আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সে এই সাময়িক গবর্নমেণ্টের হাতে ছেড়ে দেবারই বা সিদ্ধান্ত করত কি? বর্ত্তমানে পোর্ট-ব্লেয়ারে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জন্যে ভারতীয় চীফ কমিশনার নিযুক্ত করা কি সম্ভব হত? স্বাধীনতার সংগ্রামে পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয় জনগণকে জাপান বিনাসর্ত্তে সাহায্য করছে কেন? সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয়রা ছড়িয়ে আছে; তারা খুব নিকট থেকে জাপানীদের দেখবার সুযোগ পায়। জাপানের পরিচয় এবং অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হলে সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় নরনারী তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করবে কেন? আপনি একজন লোককে বলপ্রয়োগে বাধ্য করতে পারেন কিংবা মিষ্ট কথায় তাকে ভুলিয়ে নিজের ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়ায় ছড়ানো ত্রিশ লক্ষ লোককে কেউ বলপ্রয়োগে বাধ্য করতে পারে না।

পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়রা যদি প্রাণপাত চেষ্টা না করে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থত্যাগ না করে জাপানের সাহায্য নিত, তবে তারা অন্যায় কাজের দোষে দোষী হত। কিন্তু ভারতীয়রূপে একথা বলতে আমি আনন্দ ও গর্ব্ব বোধ করি যে পূর্ব্ব-এশিয়াস্থিত আমার স্বদেশবাসীরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য লোক, অর্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ-প্রচেষ্টায় তাদের শ্রেষ্ঠ শক্তি নিয়োগ করছে। স্বদেশে অর্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ এবং জাতীয় কার্য্যের জন্য লোক সংগ্রহের বিশবৎসরব্যাপী

অভিজ্ঞতা আমার কাছে। পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়েরা বর্ত্তমানে যে স্বার্থত্যাগ করছে তাঁর মূল্য আমি সেই অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দ্ধারণ করতে পারি। তাদের প্রচেষ্টা অত্যদ্ভুত। তারা সবচেয়ে বেশী স্বার্থত্যাগের জন্যে প্রস্তুত আছে বলেই অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ প্রভৃতি যে সব অত্যাবশ্যক দ্রব্য আমরা প্রস্তুত করতে পারি না, সেগুলো সাহায্যস্বরূপ জাপানের কাছ থেকে নেওয়াতে আমি আপত্তির কারণ দেখি না।

মহাত্মাজী, আমরা এখানে এখন যে সামরিক গবর্নমেণ্ট গঠন করেছি, তার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজাদ-হিন্দ (কিংবা স্বাধীন ভারত সাময়িক গবর্নমেণ্ট জাপান, জার্ম্মানী এবং অন্য সাতটি মিত্র গবর্নমেণ্টের পদ মর্য্যাদা ও সম্মান পেয়েছে। সশস্ত্র সংগ্রামের মারফৎ ব্রিটিশ অধীনতা পাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করাই সাময়িক গবর্নমেণ্টের একমাত্র লক্ষ্য। ইংরাজদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার পর শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হলেই সাময়িক গবর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। মহাত্মাজী, আমি এসম্বন্ধে আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে পারি যে, আমি এবং আমার সহকর্ম্মীরা নিজেদের ভারতীয় জনগণের ভৃত্য বলে বিবেচনা করি। আমাদের প্রচেষ্টা, আমাদের যন্ত্রণাভোগ এবং আমাদের স্বার্থত্যাগের পরিবর্ত্তে পুরস্কার স্বরূপ আমরা শুধু চাই মাতৃভূমির স্বাধীনতা। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ভারত স্বাধীন হলেই রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণে ইচ্ছুক। বাকী সকলে স্বাধীন ভারতে যে কোন সাধারণ পদ পেলেই সন্তুষ্ট হবে। আমাদের অন্তরে আজ যে-কথাটা প্রধান জাগছে সেটা হচ্ছে এই যে, বৃটিশ শাসনে সর্ব্বোচ্চ পদের অধিকারী না হয়ে স্বাধীন ভারতে ঝাড়ুদারের কাজ করাও অনেক গুণে ভাল। আমরা সবাই জানি, ভারত স্বাধীন হলে, যাঁদের হাতে ভারতের ভবিষ্যৎ তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে এরূপ লক্ষ লক্ষ সমর্থ নরনারী আমাদের দেশে আছেন।

ভারতের বুক থেকে শেষ ব্রিটিশটিকে না তাড়াতে পারা পর্য্যন্ত জাপানের কাছ থেকে আমাদের কতটা সাহায্যের প্রয়োজন হবে, সেটা নির্ভর করবে আমরা ভারতের মধ্য থেকে কতটা সহযোগিতা পাই না পাই—তার উপর। জাপান নিজে জোর করে আমাদের সাহায্য দিতে চায় না। নিজেদের প্রচেষ্টায় ভারতীয় জনগণ যদি নিজেদের মুক্তি বিধান করতে পারে, তবে জাপান খুসিই হবে। বৃটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আমরাই জাপানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি—কেননা বিপক্ষীয়েরাও অন্যান্য শক্তির কাছে সাহায্য চাইছে। যাই হোক, আমার আশা আছে যে ভারতস্থিত আমার দেশবাসীদের কাছ থেকে আমরা এত বেশী সাহায্য পাব যে, জাপানের কাছ থেকে আমাদের অতি সামান্য সাহায্য নিলেও চলবে। কোন প্রকারে ভারতস্থিত আমাদের দেশবাসীরা যদি নিজ চেষ্টায় নিজেদের মুক্তি বিধান করতে পারে কিংবা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি আপনার "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব গ্রহণ করে তদনুযায়ী কাজ করে, তবে আমার চেয়ে বেশী সুখী কেউ হবে না। আমরা কিন্তু এই ধারণা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি, উল্লিখিত দুটি সম্ভাবনার একটিও বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে না এবং সশস্ত্র সংগ্রাম অনিবার্য্য।

মহাত্মাজী, প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্ব্বে আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করব—সেটা বর্ত্তমান যুদ্ধের শেষ ফলাফল-ঘটিত প্রশ্ন। তারা বিজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত, এই ধারণা সৃষ্টির জন্যে ইংরেজরা যে ধরণের প্রচার-কার্য্য চালাচ্ছে তার সঙ্গে আমি ভালভাবেই পরিচিত। কিন্তু আমি আশা করি, আমার দেশবাসী সেই প্রচারে প্রতারিত হবে না এবং এযুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদ্বয় জয়লাভ করবে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষের কথা ভাববে না। যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্যে খোলা চোখে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে, ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তে

ও ভারতের অভ্যন্তরে শত্রুর আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার কথা জেনে এবং আমাদের শক্তি ও সমর-সামর্থ্যের পরিমাপ করে, আমার মনে আমাদের শেষ বিজয় সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। আমাদের শত্রুর শক্তি এক ফোঁটাও কম করে দেখার মত মূর্খ আমি নই। আমি জানি আমাদের সম্মুখে দীর্ঘস্থায়ী কঠিন সংগ্রাম আছে। আমি জানি যে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে শেষ চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে বৃটেন ভারতের মাটিতে সাহসের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করবে। কিন্তু আমি এও জানি, সংগ্রাম যতই দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন হোক, এর ফল হতে পারে শুধু একটি—আমাদেরই বিজয়। ভারতের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম সুরু হয়েছে। ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা বীরের মতো যুদ্ধ করছে এবং কষ্ট ও অসুবিধা সত্ত্বেও তারা ধীর স্থির গতিতে এগিয়ে চলেছে। সর্ব্বশেষ বৃটেনবাসীকে যে পর্য্যন্ত ভারতের বুক থেকে বিতাড়িত না করা যায় এবং নয়াদিল্লীতে বড়লাটের বাড়ীতে যে পর্য্যন্ত আমাদের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়বার সুযোগ না পায়, সে পর্য্যন্ত এই সশস্ত্র সংগ্রাম চলবেই।

আমাদের জাতির জনক! ভারতে এই পবিত্র মুক্তি-সংগ্রামে আমরা আপনার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।

ইউরোপের অবস্থা

ভারত এবং আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে ইউরোপীয় পরিস্থিতির যে সম্পর্ক আছে সেই সম্বন্ধে কিছু বলছি। আমি যা বলব তা অন্য কারও মত নয়—আমার ব্যক্তিগত মত। আমার বিশ্বাস এবং আশা আছে, আমি যে বর্ণনা দেব তাতে অন্ততঃ বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবনে আপনাদের কিছু সাহায্য হবে। রাজনৈতিক হোক, আর সামরিক হোক, কোন বিশেষ পরিস্থিতির পরিমাপে সর্ব্বদাই নিজের অজ্ঞাতসারে ইচ্ছানুরূপ চিন্তার আশঙ্কা থাকে। যে বিচার এইভাবে ব্যক্তিগত পছন্দ কিংবা কুসংস্কার কিংবা ইচ্ছানুরূপ চিন্তার দ্বারা দূষিত হয়, তা প্রায়ই বিশ্বাসের অযোগ্য। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পরিস্থিতির পরিমাপে আমি নিজের ইচ্ছানুরূপ চিন্তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করবার যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছি। বিচারে একপেশে হবার মতো কোন উদ্দেশ্য আমার নেই—কেন না আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ভারতীয় পরিস্থিতি ইউরোপীয় পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয় এবং ইউরোপে যাই ঘটুক না কেন, ভারতীয় জনগণ নিজেদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করবেই।

এই বিশ্লেষণের যথোপযুক্ত পটভূমি সৃষ্টির জন্যে, গত বিশ্বযুদ্ধে (প্রথম মহাযুদ্ধ) কি ভাবে এবং কেন মিত্রশক্তি জয়লাভ করেছিল ও জার্ম্মানী হেরেছিল, আমি প্রথমে সেই প্রশ্নেরই আলোচনা করব। বিগত যুদ্ধে ফরাসী জনগণ অনুভব করত, তারা নিজেদের গৃহ সম্পদ—জীবনে যা কিছু তাদের প্রিয়—তারই জন্য লড়াই করছে; এবং তারা আলসাস-লরেনকে ফরাসী অঞ্চল বলে মনে করত, তার পুনরুদ্ধারও যুদ্ধের অন্যতম

উদ্দেশ্য ছিল। তাই ফরাসী জনগণ ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের মনে উচ্চশ্রেণীর নৈতিক প্রেরণাও ছিল—যাকে বলা চলে "করব—নয় তো মরব"-মনোবৃত্তি। পক্ষান্তরে জার্ম্মান বাহিনী সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত এবং কর্ম্ম-নিপুণ যন্ত্রের মতো হলেও তাদের মধ্যে অভাব ছিল ফরাসীবাহিনীসুলভ নৈতিক প্রেরণার। মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক মার্শাল-দলের স্মৃতিকথা পড়লেই এ সত্য বোঝা যায়। অপর কারণ ছিল, জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে দুর্ব্বলতা; তারই ফলে জার্ম্মানী দীর্ঘ অবরোধ সইতে পারেনি। বর্ত্তমান যুদ্ধে কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। জার্ম্মানীর যা ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ ও দাবী, জার্ম্মানী তারই জন্যে যুদ্ধ করছে। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে সমস্ত জাতিকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়েছিল এবং তাদের প্রত্যেকের মনে এ ধারণা দৃঢ়মূল করে দেয়া হয়েছিল যে, এ যুদ্ধে পরাজয়ের অর্থ জার্ম্মান জনগণের সামগ্রিক বিনাশ। কাজেই বিগত যুদ্ধে মিত্রপক্ষের—বিশেষ করে ফ্রান্সের যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধে তা পাচ্ছে জার্ম্মানরা। তার আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি সম্বন্ধে বলতে হয়, বিগত যুদ্ধে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে জার্ম্মানী চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যে তার সমরায়োজনের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। তা ছাড়া, রাশিয়া ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ দখল ও নিয়ন্ত্রণ করে জার্ম্মানী যুদ্ধকালেই তার অর্থনৈতিক অবস্থা দৃঢ়তর করেছে। ফলে বর্ত্তমানে সে দীর্ঘ যুদ্ধের এবং দীর্ঘস্থায়ী সামুদ্রিক অবরোধের ক্লেশ সহ্য করতে পারবে।

বিগত যুদ্ধে ফরাসী এবং ইটালীয় জাতি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। ফ্রান্স সম্বন্ধে বলা যায়, এই দেশটি খুব শক্তিশালী ছিল এবং সমগ্র যুদ্ধে নির্ভীক রণনৈপুণ্য দেখিয়েছিল। ফ্রান্স এবং ইটালী সহ ইউরোপের একটা বৃহৎ অঞ্চল ছিল জার্ম্মানীর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আজ পরিস্থিতি কত ভিন্ন! কার্যতঃ রাশিয়া ছাড়া সমগ্র

ইউরোপ জার্ম্মানীর প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে; জার্ম্মানীর সম্মুখে আজ একটিমাত্র গুরুতর সমস্যা—রাশিয়া। ইটালী ও ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের অবতরণ জার্ম্মান জনগণের পক্ষে অতিরিক্ত দুর্ভোগ ও ক্লেশের কারণ হলেও এতে জার্ম্মানদের মনোবল বেড়ে গেছে। এটা সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে, ইটালীরা কিংবা ফরাসীরা—কেউই নিজেদের দেশের ভিতরে যুদ্ধ অভ্যর্থনা করবে না। একথাও সর্ব্বজনবিদিত, মিত্রশক্তি ইটালীর রাজা এবং ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী বদোগ্লিওর সঙ্গে যে গোপন চুক্তি করেছে, ইটালীর জনগণের মনে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে; এতে মিত্রশক্তি হতাশ হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সে মিত্রশক্তির অভিযান সম্বন্ধেও ফরাসী জাতির উদাসীনতা দেখে মিত্রশক্তি ভয়ানক হতাশ হয়েছে। কেউ যদি আমার এ বিবরণ বিশ্বাস না করেন, তবে তিনি মার্কিণ সংবাদপত্রগুলো এবং ফ্রান্স থেকে প্রেরিত আমেরিকার যুদ্ধ-সংবাদ-দাতাদের বিবরণ পড়ে দেখুন।

কোন কোন লোক এইরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত যে ভাগ্য সর্ব্বদাই বৃটিশদের আনুকূল্য করে এবং শেষ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ড যে কোন প্রকারে বিজয় লাভ করবেই। শুধু সরলবিশ্বাসী লোকই এরূপ কথা বলতে পারে। ইতিহাস বড় কড়া বিধাতা; ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা দৈবক্রমে ঘটে না। প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে। বিগত মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজয় দৈবঘটনা-জনিত ছিল না—সে বিজয়লাভ সম্ভব হয়েছিল কয়েকটি বিশিষ্ট কারণে। আজকের ইউরোপে ভবিষ্যৎ অনুধাবনের কি কি উপাদান আছে এবং এই সব উপাদান থেকে শেষ পর্য্যন্ত কি ফল দাঁড়াবে—আমাদের তা খুঁজে বের করতে হবে।

আমি সংক্ষেপে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২এর শেষ পর্য্যন্ত পরিস্থিতির আলোচনা করছি; তারপর চলে আসব বর্ত্তমান পরিস্থিতির পর্য্যা-লোচনায়। ১৯৪০, ১৯৪১ এবং ১৯৪২-এ বৃটিশরা দারুণ দুর্দ্দশার

মধ্যে ছিল, প্রত্যেক রণাঙ্গনে তারা পরাজয়ের পর পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। তখন তারা নিজের জনগণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস পেয়েছিল। সেই সময় তারা রোজই মার্কিণ সমরায়োজনের কথা বলত; মার্কিণ সমরায়োজন ও আর্থিক সংস্থান বৃটেনকে যুদ্ধ-জয়ে সাহায্য করবে এই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে অবাস্তব সংখ্যার প্রচার করত। ভারতের উদ্দেশ্যে তাদের প্রচার-কার্য্যে বৃটিশরা অনবরত যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কথা বলত, কমিটি গঠন করত এবং সে উদ্দেশ্যে অর্থাদিও রেখে দিত—যাতে ভারতীয় জনগণের মনে ধারণা জন্মে যে, বৃটিশরা যুদ্ধজয় সম্বন্ধে স্থিরবিশ্বাসী। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রচারে বিশেষ কিছু কাজ হয় নি। তারপর থেকে ইউরোপে অন্ততঃ যুদ্ধের হাওয়া কিছুটা মিত্র-পক্ষের অনুকূলে বইতে সুরু করেছে। কিন্তু, ইউরোপে মিত্রশক্তির সাম্প্রতিক সাফল্যকে যদি সযত্নে বিশ্লেষণ করা যায়, দেখা যাবে এসব সাফল্যের অধিকাংশই আমেরিকার সমর-সামর্থ্যের দরুণ। আজ যদি মিত্রপক্ষীয় মনোবল দু-বছর আগেকার চেয়ে উচ্চতর হয়ে থাকে, তবে তা-ও সম্পূর্ণভাবে কিংবা প্রধানতঃ হয়েছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কার্য্যকারিতার দরুণ। স্বতন্ত্র ভাবে বিবেচনা করলে, বৃটিশ মনোবল আজও অনেক কম। এই জন্মেই বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। প্রত্যেক রণাঙ্গণেই উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল আমেরিকান সেনাধ্যক্ষদের মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন;—দাবী ওঠা মাত্র আমেরিকার কাছে বহু মূল্যবান বৃটিশ অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন—এমন কি যাকে নিজের রাজ্যের অধিকার ছেড়ে দেওয়া (extra-territorial right) বলে, আমেরিকাকে তাও দিতে হয়েছে। আরও মজার ব্যাপার এই যে, মিঃ চার্চ্চিলের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী শাসক-গোষ্ঠী এবং তাঁদের মতের উপাসক ও

পরিপোষক বুদ্ধিবাদীরাও খোলাখুলি আমেরিকানদের "মার্কিন শতাব্দীর" মতবাদ স্বীকার করে নিচ্ছেন। অন্য ভাবে বলতে গেলে তাঁরা স্পষ্ট স্বীকার করেন যে, বৃহত্তর রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে বৃটেনকে স্থান ছেড়ে দিতে হবে এবং এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে আমেরিকার সাহায্য কিংবা সম্মতির সুযোগে বৃটেন তার সাম্রাজ্যের যতখানি পারে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। বৃটেন যে ভারতকে কোন সুযোগ দিতে চায় না কিংবা ভারতের স্বাধীনতা দাবীর প্রশ্নে আমেরিকা যে বৃটেনের উপর চাপ দিতে অনিচ্ছুক—তার মূল কারণ এর মধ্যেই নিহিত। বৃটেনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধশেষে ভারতকে আরও শোষণ করা এবং এইভাবে অন্ততঃ আংশিক ভাবে তার বর্তমান ক্ষতির পরিপূরণ করা। এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধশেষে চিরদিনের মতো ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে নিষ্পেষিত করার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই লণ্ডনে রচিত হয়েছে। বৃটিশ রাজনীতিবিদরা বোঝেন যে তাঁরা এপর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে দমন করতে পারেননি। এপর্য্যন্ত অনুসৃত ভেদনীতির শাসন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে হেয় করার জন্যে দেশীয় নৃপতি, মুসলমান এবং তথাকথিত তপশীলী শ্রেণীর প্রতি পার্থক্যময় ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। নিজেদের ধরণে ভারতীয় প্রশ্ন-সমাধানের যে ব্যবস্থা বৃটিশ রাজনীতিবিদরা করে রেখেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। এসম্বন্ধে আমি অন্য কোনদিন বলব।

১৯৪২-এর নবেম্বর থেকে প্রায় সম্পূর্ণতর আমেরিকার সাহায্য ও হস্তক্ষেপের দরুণই এবং আমেরিকার কূটনীতির ফলে মিত্রপক্ষ উত্তর-আফ্রিকায় ও পরে ইটালীতে সাফল্য লাভ করতে পেরেছে। আমেরিকার কূটনীতির খেলা সার্থক না হলে ফ্রান্সের অ্যাডমিরাল দাঁর্লার দল মিত্র-পক্ষে যোগ দিত না। এবং দাঁর্লার সাহায্য ছাড়া উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভ করা সম্ভব হত কিনা—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের

অবকাশ আছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু দ'লোর দলের বিরুদ্ধে জেনারেল দ্য গলকে সমর্থন করছিলেন এবং এখনও করছেন। এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোন বোঝাপড়া হয় নি—যদিও বৃটিশের জেদের ফলে জেনারেল দ্য গল্ বর্ত্তমানে দ'লোর উত্তরাধিকারী জেনারেল জিরোকে পরাজিত করেছেন। এই বোঝাপড়া না থাকার একটা ফল হয়েছে এই যে, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কূটনৈতিক বিজয়লাভ করেছে এবং ফরাসী উত্তর-আফ্রিকায় নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেছে। বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই বোঝাপড়ার অভাবের দরুণ আর একটা ফল হয়েছে, জেনারেল দ্য গল ইউরোপীয় রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সর্ব্বাধিনায়ক আমেরিকান জেনারেল আইসেনহাও-য়ারের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি নন বলে, তিনি কোন স্থানই পাননি। মিত্রপক্ষ ফ্রান্সের কোন অংশ যদি দখল করতে পারে, সে অঞ্চল জেনারেল দ্য গলের কমিটির হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না—মিত্রপক্ষীয় সামরিক গবর্ণমেণ্টই সে অঞ্চল শাসন করবে। পক্ষান্তরে জেনারেল দ্য গলের কর্ত্তৃত্বে যে সামান্ত সেনাবাহিনী আছে—তথাকথিত স্বাধীন ফরাসীবাহিনী—ইটালীতে তাদের মিত্রপক্ষের বেতনভোগী সাধারণ সৈন্তের মতোই যুদ্ধে নিযুক্ত করা হয়। সারা পৃথিবীই জানে যে ইউরোপীয় প্রশ্ন সম্পর্কে বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েটের মধ্যে কোন প্রকার বোঝাপড়া নেই। এই তিনটি শক্তির মধ্যে যে মিত্রতা আছে, সে মিত্রতার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের প্রতি সাধারণ ঘৃণা; তার মধ্যে কোন আভ্যন্তরীণ একতা ও সংহতি নেই। এ ধরণের মিত্রতায় কোন স্থায়ী ফল-লাভ হতে পারে না, কিম্বা তার দ্বারা যুদ্ধজয়ও সম্ভব নয়। গতযুদ্ধে বৃটিশ, আমেরিকান, বেলজিয়ান ও ফরাসীদের মধ্যে যে দৃঢ়সংবদ্ধ ঐক্য ছিল এ মিত্রতা তার চেয়ে ভিন্ন জিনিস। ১৯১৮ অব্দে ফ্রান্সে মিত্রশক্তির সেনা-বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক মার্সাল ফক ছিলেন সেই ঐক্যের প্রতীক বিশেষ।

ইউরোপে মিত্রপক্ষের অনুপ্রবেশকে আপাতদৃষ্টিতে বিজয় বলে মনে হলেও, তা প্রকৃত বিজয় নয়। এ বিজয় সাময়িক—নেপোলিয়ঁর রাশিয়া-বিজয় ও মস্কো অধিকারের মতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জার্মানরা ইংলণ্ড অভিযান করলে বৃটিশরা সিংহের মতো যুদ্ধ করত; দূর মহাদেশের বুকে তারা তেমন যুদ্ধ করতে পারে না—করেও না। সেনা-বাহিনী প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র নয়। সেনাবাহিনী এমন সব মানুষ নিয়েই গঠিত যাদের অনুভূতি ও হৃদয়াবেগ আছে—যারা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ করে। নেপোলিয়ঁ যখন যুবক ও যুদ্ধ-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তখন অনভিজ্ঞ ফরাসী-বাহিনী যুদ্ধ করে সারা ইউরোপে চমকপ্রদ বিজয়-লাভ করেছিল। সে সময় প্রতিক্রিয়াশীল জগতের আক্রমণ থেকে বিপ্লব ও বিপ্লবী দলকে রক্ষার জন্য সমগ্র ফ্রান্স যুদ্ধ করছিল। কিন্তু সেই একই ফরাসী-বাহিনী পরে শত্রুর হাতে পরাজিত হয়েছিল, অথচ তখন তার অভিজ্ঞতা ছিল বেশী এবং সে বাহিনীর নেতা ছিলেন ইউরোপ-বিজয়ী সম্রাট্ নেপোলিয়ঁ। বিজয়ের সময় অনভিজ্ঞ ফরাসী-বাহিনী তরুণ নেপোলিয়ঁর অধীনে একটা পবিত্র আদর্শের জন্যে যুদ্ধ করছিল। পরে সেই পবিত্র আদর্শ আর ছিল না—কেন না সম্রাট নেপোলিয়ঁ তখন ইউরোপ-বিজয়ের জন্যে যুদ্ধ করছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত সম্রাট নেপোলিয়ঁর নেতৃত্ব সত্ত্বেও ফরাসী-বাহিনী পরাজিত হয়েছিল—তার কারণ সে বাহিনীর মনোবল ও যুদ্ধোদ্যম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইঙ্গ-মার্কিণদের সম্বন্ধেও সেই একই যুক্তি খাটে। তাদের যুদ্ধের পিছনে কোন পবিত্র আদর্শ নেই, তারা শুধু বিশ্ববিজয়ের জন্যে যুদ্ধ করছে—তখন দীর্ঘকাল তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়। কাজেই আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করছি, ইউরোপে যুদ্ধ যতই মন্থর গতিতে চলতে থাকবে, মিত্রপক্ষের মনোবল ততই কমতে থাকবে।

ইতিপূর্ব্বেই আমি মন্তব্য করেছি, বৃটিশের মনোবল এখনও তুলনা

মূলক হিসাবে কম। তা সত্ত্বেও ইউরোপে আমেরিকা-বাহিনীর যতদিন রণক্লান্তি না আসে, ততদিন মিত্রপক্ষের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু সে কতদিন? সরকারী হিসাব থেকে দেখা যায়, এ যুদ্ধে আমেরিকার ক্ষতি ইতিমধ্যেই বিগত যুদ্ধে তার ক্ষতিকে ছাড়িয়ে গেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য লোকসংখ্যা প্রচুর—তবে আমাদের একথা ভুললে চলবে না, আমেরিকানরা যুদ্ধপ্রিয় জাতি নয়। তারা হচ্ছে ব্যবসায়ী ও কৃষকের জাতি। ইউরোপের যুদ্ধ আমেরিকা থেকে বহু দূরবর্ত্তী; আমেরিকার সমগ্র জাতির কাছে এ যুদ্ধ জনপ্রিয় নয়। ইউরোপের যুদ্ধ বিষয়ে যারা সব চেয়ে উৎসাহী, তারা হচ্ছে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অনুরক্ত সমর্থক—ইহুদীরা এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মহল। তারা সমগ্র পৃথিবীর উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য-বিস্তারের স্বপ্ন দেখে। প্রভাবশালী স্বাতন্ত্র্যবাদী দল ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে উদাসীন—যদিও প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ সম্বন্ধে তারা উৎসাহশীল। তাছাড়া, ইউরোপীয় রণাঙ্গন ত্যাগ করে প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তি সন্নিবদ্ধ করার একটা অবিচ্ছিন্ন পৌনঃপুনিক দাবী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শোনা যাচ্ছে। কাজেই যুদ্ধে মার্কিণ ক্ষতির পরিমাণ যতই বাড়বে, ততই প্রতিবাদ সুরু হবে এবং রণক্লান্তিও বাড়তে থাকবে। তাছাড়া, সমর-কৌশলের দিক থেকে সরবরাহের অঞ্চল যত বিস্তৃততর হবে, ততই অতিরিক্ত অসুবিধার সৃষ্টি হবে; এখন আমেরিকানরা যে অসুবিধা ভোগ করছে নতুন সমস্যা দেখা দিলে তার পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যাবে। আমেরিকানরা যখনই রণক্লান্তি দেখাবে, তখনই তাদের পতনের সুরু হবে এবং ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিণ পরাজয়েরও সূত্রপাত হবে।

অতঃপর সোভিয়েট রাশিয়ার প্রশ্ন। সোভিয়েট কি জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করে যুদ্ধের গতি ফেরাতে পারবে? মিত্রপক্ষের প্রচারকদের সদম্ভ প্রচারানুযায়ী তারা কি সত্যিসত্যি বার্লিনে প্রবেশ করতে পারবে? এ

প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের এ যুদ্ধে রাশিয়ার ক্ষতি এবং তার যুদ্ধ-পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা বিচার করে দেখতে হবে। সৈন্য ও সমরোপকরণের দিক থেকে রাশিয়ার ক্ষতি হয়েছে অপরিমেয়। কাজেই ভবিষ্যতে তারা সীমাবদ্ধ যুদ্ধ-প্রচেষ্টা করতে পারবে। মার্শাল ষ্টালিনের চমৎকার প্রচারকার্য্যের দরুণ জনগণের মনোবল এত বেড়ে গেছে যে, তারা ক্ষতি সহ্য করে এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারছে। কিন্তু এতদিন তারা যুদ্ধ করছিল মাতৃভূমির জন্যে—নিজেদের গৃহ-সম্পদ রক্ষার জন্যে। রাশিয়ার বাইরে তাদের সে যুদ্ধ-স্পৃহা থাকবে না। তা ছাড়া জার্ম্মানবাহিনী ষ্টালিনগ্রাড অভিযানের সময় যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল, রুশ-বাহিনীও সেই সব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কাজেই, ১৯৩৯এর সীমা-রেখায় পৌঁছানোর পর সোভিয়েট-বাহিনী খুব বেশী অগ্রসর হতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। আর একথাও মনে রাখতে হবে, মিত্রপক্ষের যদি জয়ই হয়, তবে ইউরোপের ভাগ্য কি রকম দাঁড়াবে সে সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদ্বয় এবং সোভিয়েটের মধ্যে কোন বোঝাপড়া হয়নি। কার্য্যতঃ ইউরোপের বহু অঞ্চলে একপক্ষে ইঙ্গ-মার্কিণদের অভিপ্রায় এবং অপরপক্ষে সোভিয়েটের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, ইঙ্গ-মার্কিণরা এখন নিজেদের ইউরোপীয় অভিযানকে সরবে প্রচার করছে বটে, কিন্তু সোভিয়েট পররাষ্ট্র-বিভাগের মুখপত্র "ওয়ার এণ্ড ওয়ার্কিং ক্লাস" পত্রিকা তথাকথিত দ্বিতীয় রনাঙ্গণকে ছোট করে দেখছে এবং ইঙ্গ-মার্কিণদের সতর্ক করে দিয়েছে, তারা যদি রণাঙ্গনের বিস্তৃতি সাধন না করে ও ফ্রান্সে আরও সৈন্য ও সমরোপকরণ নিয়োজিত না করে, তবে একদিন জার্ম্মান-বাহিনীর হাতে তাদের অত্যন্ত বিপদে পড়তে হতে পারে।

আরও লক্ষ্য করার বিষয়, ইঙ্গ-মার্কিণরা আফ্রিকা ও এশিয়ায়

সোভিয়েট গবর্নমেণ্টের রাজনৈতিক অভিযানে আদৌ সন্তুষ্ট নয়। উদাহরণ স্বরূপ উত্তর-আফ্রিকা, সিরিয়া, মিসর ও ইরানের নাম করা যায়। তাছাড়া, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, বাল্টিক ও বল্কান রাজ্যসমূহ এবং দার্দ্দিনলেস প্রণালীতে সোভিয়েট গবর্নমেণ্টের যে মনোগত অভিপ্রায়, তাকেও ইঙ্গ-মার্কিণরা আনুকূল্যের চোখে দেখে না। ১৯১২ অব্দে বল্কান-শক্তিপুঞ্জ যখন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তখন তাদের মধ্যে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, মিত্রপক্ষীয় শিবিরেও অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব একেবারে অসম্ভব নয়। ১৯৩৯-এর সীমান্ত অতিক্রম করে সোভিয়েট-বাহিনীর অগ্রগতি যদি কখনও সম্ভব হয়, তবে তার ফলে অপ্রত্যাশিত জটিলতা দেখা দিতে পারে। ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদ্বয় ও সোভিয়েটের মধ্যে যে বোঝাপড়ার অভাব ও সংঘাত আছে তা তখন আরও বেড়ে যাবে।

এর ফলে আমরা তুরস্ক সমস্যার মধ্যে এসে পড়ি। বৃটিশ প্রচারকরা বিশ্ববাসীর মনে এই ধারণা সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছে যে, এমন দিন আসবে যখন তুরস্ক মিত্রশক্তিদের পক্ষে যোগ দেবে। এই প্রচারকরা ভাবে, এই ধরণের প্রচারকার্য্য বৃটিশ-সমর্থনে ভারতীয় মুসলমানদের প্রভাবিত করবে। কিন্তু আধুনিক তুরস্ক সম্বন্ধে যার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, সে এই ধরণের অভিমতে আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না। তুরস্কে যদিও এমন সব উপদল আছে যারা স্পষ্টতঃ মিত্রপক্ষের সমর্থক এবং যদিও আঙ্কারার বেতার-কেন্দ্রের সুরও মিত্রপক্ষ-সমর্থন করছে, তবু যুদ্ধরত উভয় পক্ষের কোনদিকেই তুরস্কের যোগদানের সম্ভাবনা নেই।

আমি প্রথমেই বলেছি, মিত্রপক্ষীয় শিবিরে মনোবল কৃত্রিম উপায়ে বাড়ানোর জন্যে প্রচারকরা আমেরিকার যুদ্ধ-পণ্যোৎপাদনের প্রাচুর্য্য নিয়ে খুব হৈ চৈ করেছে। কিন্তু আমেরিকার পণ্যোৎপাদন ইতিমধ্যেই সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেচে, এবং ভবিষ্যতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না

হয়ে এ উৎপাদন কমে যাবে। আর জার্ম্মানীর কথা বলতে গেলে সাম্প্রতিক বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও তার যুদ্ধ-পণ্যোৎপাদন তেমন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। কার্যতঃ কোন কোন বিষয়ে উৎপাদন বেড়েই গেছে। কাজেই জার্ম্মান যুদ্ধ-পণ্যোৎপাদন যুদ্ধ-পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে, এ সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

ইউরোপের অবস্থা অতি সংক্ষেপে আমি এখন বর্ণনা করছি ঃ

পূর্ব্ব রণাঙ্গনে জার্ম্মানদের পক্ষে রাশিয়াকে পরাজিত করা সম্ভব হয় নি। ঠিক সেইভাবে রুশদের পক্ষেও জার্ম্মানীকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। আমার কাছে যেটা খুব বেশী সম্ভব বলে মনে হয় সেটা হচ্ছে এই যে, এক ধরণের অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে—যার ফলে উভয় পক্ষই হয়তো পরিখা খুঁড়ে মুখোমুখি অপেক্ষা করবে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে কিন্তু কিছুকাল পরেই জার্ম্মানীর অনুকূলে যুদ্ধের গতি ফিরবে। তখন জার্ম্মানদের পক্ষে ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিণদের প্রত্যাঘাত করা সম্ভব হবে। ইটালীতে জার্ম্মানরা উপদ্বীপভাগ ত্যাগ করে উত্তর-ইটালীতে পশ্চাদপসরণ করবার পূর্ব্বে চূড়ান্ত রকম আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম করবে। উত্তর-ইটালীতে তারা দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে অবস্থান করবে; সেখান থেকে তাদের হটিয়ে দেওয়া ইঙ্গ-মার্কিণদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ইটালী ও ফরাসী রণাঙ্গন সম্বন্ধে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, মিত্রপক্ষের মনোবল ক্ষুণ্ণ হতে আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মানরা এ দুটি রণাঙ্গনে ঠিক থাকতে পারবে। জার্ম্মান-মনোবল ভেঙে যাবার কোন সম্ভাবনা আমি দেখি না। ইতিমধ্যেই জার্ম্মানীর উপর বিমান-আক্রমণ শিথিল হতে সুরু করেছে এবং উড়ন্ত-বোমার সাহায্যে জার্ম্মানী নূতন আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়েছে। জার্ম্মান মনোবলের উপর এর প্রভাব হয়েছে চমৎকার। পরের কয়েক মাস জার্ম্মানীর পক্ষে সঙ্কটজনক হবে। কিন্তু তারপর জার্ম্মানীর আবার সুদিন আসবে। আমার এই

ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হতে পারে যদি জার্ম্মান-মনোবলের আকস্মিক অধঃপতন ঘটে—যেমন বিগত যুদ্ধে হয়েছিল। কিন্তু তার কোন লক্ষণই আমি দেখছি না। মার্শাল ষ্টালিন যেমন রাশিয়ায় সমস্ত প্রতিরোধের অবসান করেছিলেন, ফুয়েরারও তেমনি জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে সমস্ত প্রতিরোধ ধ্বংস করে আগে থেকেই এ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করছেন।

ইউরোপের এ যুদ্ধ শুধু অস্ত্রের যুদ্ধই হবে না, হবে স্নায়ুর যুদ্ধও। যে পক্ষের মনোবল বেশী থাকবে সেই পক্ষই জিতবে—এবং সে হচ্ছে জার্ম্মান পক্ষ। নিছক ভারতীয় দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করলে ইউরোপের দীর্ঘ যুদ্ধ আমাদের পক্ষে এই অর্থে উপকারী হবে যে, এর ফলে মিত্র-পক্ষীয় সেনা সেখানে আটক পড়ে থাকবে। ইঙ্গ-মার্কিণরা ইউরোপ মহাদেশকে যদি না ঘাঁটাত এবং তারা যদি ইটালী ও ফ্রান্সে সৈন্যাবতারণ না করত, তবে তারা ভারতে এবং পূর্ব্ব-এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে তাদের স্থল-সৈন্য ও নৌ-সৈন্য নিয়োগ করতে পারত। কাজেই, ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিণদের বর্ত্তমান অভিযান আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সাহায্যের মতোই।

ভারতীয় পরিস্থিতি ইউরোপীর পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়। ভবিষ্যতে ইউরোপে যা-ই ঘটুক না কেন, ভারতীয় জনগণ আজ স্বাধীনতা-অর্জ্জনের দৈবপ্রেরিত সুযোগ পেয়েছে। কাজেই, ইউরোপীয় পরিস্থিতি যদিও আমাদের ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে থাকবে, তবু সেখানে কি ঘটবে না ঘটবে তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর বিশেষ প্রয়োজন নেই। মুক্তি আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। আসুন, সুযোগ থাকতে থাকতে আমরা তাকে মুঠো করে ধরি। লোহা গরম থাকতে থাকতেই তার উপর আঘাত করতে হবে।

বেতার-বক্তৃতা : ৮ই জুলাই, ১৯৪৪

পূর্ব্ব-এশিয়ার অবস্থা

ইউরোপের অবস্থা সম্বন্ধে বলেছি। এখন ভারত প্রসঙ্গে পূর্ব্ব-এশিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে বলব। আগেকার মতো আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই কথা বলব—বই পড়া বিদ্যে দিয়ে নয়।

বিগত বিশ্বযুদ্ধে সাধারণ অবস্থা কি রকম ছিল আর এযুদ্ধেই বা কি রকম আছে, সে সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা দিয়ে আমি এখনকার বিষয় বস্তুর আলোচনা সুরু করব। বিগত বিশ্বযুদ্ধে জাপান মিত্রপক্ষে ছিল, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুরা ছিল শুধু ইউরোপে এবং নিকট-প্রাচ্যে অর্থাৎ পশ্চিম-এশিয়ায়। গতযুদ্ধের সময় যে সব ভারতীয় বিপ্লবী ভারতের বাইরে কাজ করছিলেন এবং যাঁরা ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের জন্যে ভারতে সাহায্য আনার চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের কাছে সরবরাহ-পথের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় সমাধানের অতীত। সাগর-পথে "কোমাগাটা মারু" এবং অন্যান্য জাহাজে করে ভারতে সাহায্য আনার চেষ্টা খুব সহজেই ব্যর্থ হয়েছিল—আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশের পথ ছিল বৃটিশদের দ্বারা বিশেষভাবে সুরক্ষিত। বর্ত্তমান যুদ্ধ ভারতের পূর্ব্ব-দ্বার খুলে দিয়েছে; এখন সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

গত যুদ্ধে বৃটিশরা তাদের সমস্ত যুদ্ধ-প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে পেরেছিল ইউরোপ ও নিকট-প্রাচ্যে—কারণ এশিয়ার বাকি অংশ ছিল মিত্রপক্ষের প্রভাব কিংবা নিয়ন্ত্রণাধীন। এযুদ্ধে ১৯৪১-এর ডিসেম্বর থেকে আমাদের মিত্রপক্ষীয়দের শুধু ইউরোপ এবং নিকট-প্রাচ্যেই যুদ্ধ

করতে হচ্ছে না—পূর্ব্ব-এশিয়ায়ও যুদ্ধ করতে হচ্ছে। এইভাবে তাদের শক্তি এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ায় এবং জাপানী সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর হাতে ইঙ্গ-মার্কিণের ভয়ঙ্কর পরাজয়ের পর ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ইউরোপের যুদ্ধ এবং ১৯৪১-এর ডিসেম্বর থেকে পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধ ভারতের জনগণকে বুঝিয়ে দিয়েছে, বৃটিশ সিংহের ভয়ে এককালে তারা ভীত ছিল বটে, কিন্তু বৃটিশ-সিংহের পা মাটির তৈরী। ভারতীয় জনগণের কাছে এই ভাবে বৃটিশ-সম্মান ভেঙে পড়ার কারণ পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানের শক্তি এবং ইউরোপে জার্ম্মানীর শক্তি ভয়ঙ্কর। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং সম্মানের অপূরণীয় হানি হওয়ায়—বৃটিশ-সাম্রাজ্যের আয়ু আজ শেষ হয়ে এসেছে।

বর্ত্তমানে বিরাট বিশ্বযুদ্ধ চলছে,—বৃটিশরা ভবিষ্যতে তাদের বিশ্বনেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে কিনা সেই প্রশ্ন মীমাংসার জন্যে এ যুদ্ধ নয়। সে সমস্যার সমাধান ইতিপূর্ব্বেই হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন এমন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ইতিবৃত্তবিদের কাছে বৃটিশ-সাম্রাজ্য আজ দরজার পেরেকের মতই মৃত। সমাধানের একটিমাত্র প্রশ্নই আছে; সেটা হচ্ছে এই যে, ভবিষ্যতে বিশ্বকর্ত্তৃত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে যাবে, না—এমন কোন নতুন বিশ্ববিধান দেখা দেবে যার ফলে পৃথিবীর সমস্ত জাতির স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকার স্বীকৃত হবে। কখন আমার সেই সব স্বদেশবাসীর কথা মনে হয়, যাঁরা এখনও এমন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছেন যেখানে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় থাকবে এবং যে ব্যবস্থায় ভারতীয়রা ক্রীতদাসের মতই থেকে যাবে; তখন এঁদের জন্যে করুণা অনুভব করি—দাসত্বের ফলে এঁদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে গভীর অধঃপতন ঘটেছে। দাসত্বের অন্ধকার এমনভাবে তাঁদের অন্ধ করেছে যে তাঁরা উদীয়মান স্বাধীনতার সূর্য্য আদৌ দেখতে পাচ্ছেন না।

দাসত্বের বিষে দুষ্ট শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান এমন ভারতীয়ও আছেন, যাঁরা ভুলে যান—ব্যক্তিদের মতো সাম্রাজ্যেরও বয়স' হয়, জরা আসে এবং মৃত্যু হয়। বার্দ্ধক্য এবং তজ্জনিত জরার আক্রমণ সুরু হলে, পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। কৃত্রিম গ্রন্থি সংযোগ করে কিংবা যাদু-যষ্টির ব্যবহারে বৃদ্ধ কখনও যুবক হতে পারে না। মার্কিণ-যষ্টির সাহায্যে বৃদ্ধ উইনষ্টন চার্চ্চিল তাঁর অতি-বৃদ্ধ সাম্রাজ্য নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু হংকং থেকে চিন্দুইন নদী পর্য্যন্ত যে সাম্রাজ্য কয়েক মাসের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে, দৈবশক্তির দ্বারাও আর তার পুনর্জীবন সম্ভব নয়। এই অঞ্চল সম্বন্ধে এখন মাত্র দুটি সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন। প্রথমতঃ পূর্ব্ব-এশিয়ায় শোচনীয় পরাজয়ের ফলে ইঙ্গ-মার্কিণরা যা হারিয়েছে মার্কিণের শক্তি ও সমরায়োজন তা পুনরুদ্ধার করতে পারবে কি? দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে ভারতের ভাগ্যে কি ঘটবে? আমরিকার সাহায্যে বৃটেন তার ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারবে কি?

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি স্বীকারই করছি, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সিদ্ধান্ত করেছেন, যে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদ্বয় প্রথমে ইউরোপের রণাঙ্গনে সকল শক্তি সন্নিবদ্ধ করবে; যতদিন বিশ্বের দরবারে এ ঘোষণা করা হয় নি, ততদিন আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। তাঁরা যদি বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে "প্রশান্ত মহাসাগর প্রথম" নীতি অবলম্বন করতেন, তবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে আশঙ্কিত হতাম। ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যরা যদি ইটালী ও ফ্রান্সে অবতরণ না করত, এবং তারা যদি তাদের সমস্ত শক্তি প্রশান্ত মহাসাগরে নিয়োগ করত, তা হলে জাপানের সঙ্কট দেখা দিত। সুকৌশলী প্রচারকার্য্যের সাহায্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে উৎসাহের সঞ্চার করতে পারতেন; এ যুদ্ধকে তিনি সমগ্র মার্কিণ জাতির পক্ষে পবিত্র যুদ্ধ কিংবা ধর্ম্মযুদ্ধ বলেও দাঁড় করাতে পারতেন।

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে তার সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। তা ছাড়া বর্ণ-বৈষম্যের দরুণ আমেরিকানরা জাপানী ও অন্যান্য এশিয়াবাসীদের ঘৃণা করে। কাজেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে যুক্তরাষ্ট্রে সহজেই জনপ্রিয় করে তোলা যেত। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট অভাবিতপূর্ব্ব উপায়ে মার্কিণ মনোবল বাড়াতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। এবং তিনি যে তা করেন নি—এর থেকেই বোঝা যায় যে ভাগ্যদেবী জাপান, এশিয়া ও ভারতের কল্যাণ-সাধন করে চলেছেন।

ইঙ্গ-মার্কিণরা পরাজিত হবে—এটা ভাগ্যের নির্দ্দেশ। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাই ভুল করে "ইউরোপ প্রথম" নীতি গ্রহণ করেছেন। ইউরোপের যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রে আদৌ জনপ্রিয় নয়, এবং তার পিছনে যে সব কারণ আছে, তা নিয়ে এখানে আমাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কাজেই ইউরোপের যুদ্ধ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রে এমন উৎসাহের সঞ্চার করা সম্ভব নয়, যার ফলে আমেরিকার জনগণ যুদ্ধের জন্যে তাদের সব কিছু বিপন্ন করবার অনুপ্রেরণা পাবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের মতো বিরাট যুদ্ধ-জয়ের জন্যে "করব-না-হয়-মরব" মনোবৃত্তি অত্যাবশ্যক। জাপানের তা আছে এবং তাই হবে তার চূড়ান্ত বিজয়ের প্রধান কারণ।

ইঙ্গ-মার্কিণরা সর্ব্বদাই বলছে, তারা প্রথম ইউরোপের যুদ্ধ শেষ করবে; তারপর সমস্ত শক্তি নিয়ে পূর্ব্ব-এশিয়া এবং জাপানের দিকে ফিরবে। জাপানের বিরুদ্ধে চুংকিং-এর যুদ্ধের সপ্তম বার্ষিকী উপলক্ষে কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল মার্শাল চিয়াংকাইশেকের উদ্দেশে প্রেরিত বাণীতে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধ কি ভাবে শেষ হবে এবং কে তা শেষ করবে—সেটা দেখবার এখনও বাকী আছে। আমার দিক থেকে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, "ইউরোপ প্রথম" নীতির ফলে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি এত ক্ষীণ

হয়ে পড়বে যে তারা আর পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানকে কখনও পরাজিত করতে পারবে না। ইতিহাস পুনরায় এই কথা প্রমাণ করবে, কোন বড় যুদ্ধে দুই রণাঙ্গণে যুদ্ধ করা আত্মহত্যারই সামিল।

বৃটিশ প্রচারকদের মতে ইঙ্গ-মার্কিণ বিজয়ের ভিত্তি হচ্ছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত বিরাট যুদ্ধ-পণ্য উৎপাদনের আয়োজন। কিন্তু আমরা যখন মার্কিণ যুদ্ধ-পণ্যোৎপাদন বিশ্লেষণ করি, তখন দেখতে পাই যে তার একটা সীমা আছে। মার্কিণ পণ্যোৎপাদন শেষ সীমায় পৌঁছেছে; ভবিষ্যতে বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে তা হ্রাস হতে সুরু করবে। জাপান সম্বন্ধে বলতে গেলে—সে যা আয়োজন করেছে এবং ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তাতে ভবিষ্যতে জাপানের পণ্যোৎপাদন বাড়বে—এ প্রত্যাশা নির্ভয়ে করা যায়। কেউ যদি একথা অবিশ্বাস করেন, তবে তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটে না ঘটে তা দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকুন।

এখন বাকি রইল মার্কিণ মনোবলের প্রশ্ন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, আজ মার্কিণ মনোবল বৃটিশ মনোবলের চেয়ে অনেক উঁচুতে। কিন্তু সে উচ্চতা কতদিন থাকবে? যদি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট "প্রশান্ত মহাসাগর প্রথম" নীতি অবলম্বন করতেন এবং তার দ্বারা বর্ত্তমান যুদ্ধকে জনপ্রিয় জাতীয় যুদ্ধে পরিণত করতেন, তবে বহুদিন পর্য্যন্ত—এমন কি সাময়িক পরাজয় ও বিপর্য্যয় সত্ত্বেও—সে মনোবলকে উঁচুতে তুলে রাখা যেত। ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে মার্কিণ উৎসাহকে চূড়ান্তরূপে সঞ্জীবিত করা সম্ভব নয়—এ প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও আর একটি অবিসংবাদিত প্রশ্ন থেকে যায় যে, জাপান এবং জার্ম্মানি যেমন নিজেদের অস্তিত্বের জন্যে লড়াই করছে, বৃটেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্র তা করছে না। তারা যুদ্ধ করছে বিশ্ব-কর্ত্তৃত্বের জন্যে—বৃটেন চায় ভবিষ্যতে কর্ত্তৃত্ব রক্ষা করতে, আর আমেরিকা চায় ভবিষ্যতে কর্ত্তৃত্ব অর্জ্জন করতে। কাজেই বেশী দিন মনোবল অক্ষুন্ন রাখা আমেরিকানদের

পক্ষে অসম্ভব হবে। কেবল উৎপাদন জাতির মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না। যদি সমর-সজ্জার প্রাচুর্য্যই বিজয়ের কারণ হত, তবে এ যুদ্ধে জার্ম্মানির হাতে ফ্রান্সের পরাজয় হত না। সুতরাং ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাব, ইউরোপীয় রণাঙ্গনে আমেরিকার ক্ষতি যত বাড়তে থাকবে, আমেরিকার শক্তি ও মনোবল তত ক্ষুণ্ণ হবে। তারপরে যদি ইঙ্গ-মার্কিণরা তাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য পূর্ব্ব-এশিয়ায় নিয়োগ করার চেষ্টা করে, তবে তারা জাপানের পক্ষে বিশেষ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ইঙ্গ-মার্কিণরা ইউরোপের যুদ্ধ জয় করতে পারুক বা নাই পারুক, তার সঙ্গে আমার এ উক্তির সম্পর্ক নেই। আর ইঙ্গ-মার্কিণের পক্ষে ইউরোপের যুদ্ধ-জয়ের সম্ভাবনা কতটা আছে বা না আছে, সে প্রশ্নের উত্তর আমি পূর্ব্বেই দিয়েছি।

পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী এবং কঠোর হবে—জাপানের চেয়ে অন্য কেউ সে কথা বেশী করে জানে না। বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণের পূর্ব্বে জাপান সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা গণনা করে রেখেছে, এবং প্রয়োজনীয় আয়োজনও সমাপ্ত করা হয়েছে। যুদ্ধারম্ভের পর থেকে জাপান পূর্ব্ব-এশিয়ায় তার অবস্থান দৃঢ়তর করেছে এবং নিজের যুদ্ধ-পণ্যোৎপাদনও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। জাপানী জাতি ও জাপানী সেনাবাহিনীর মনোবলও বহু গুণ বেড়ে গেছে। কাজেই ভবিষ্যতে আমি মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জাপানকে পরাজিত করার কোনই সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকানরা কিছু সাফল্য লাভ করেছে; জাপানের অধিকৃত কিংবা নিয়ন্ত্রনাধীন কয়েকটি দ্বীপও তারা অধিকার করতে পেরেছে। কিন্তু এ দ্বীপগুলি রক্ষা-ব্যূহের বহির্বৃত্তে পড়ে। অন্তর্বৃত্ত—যার নাম দিতে পারি লৌহ-চক্র—এখনও জাপানীদের হাতে আছে এবং থাকবেও। এই লৌহ-চক্রে আমেরিকানরা কখনও প্রবেশ করতে পারবে না। আমেরিকানরা বহির্বৃত্তে কামড়

দিতে থাকবে, আর জাপান অন্তর্বৃত্তের উপর তার কর্ত্তৃত্ব বজায় রেখেই চলবে। মার্কিণ মনোবল ভাঙতে স্থরু না করা পর্য্যন্ত এমনি ধারাই চলতে থাকবে। এ যুদ্ধ শুধু অস্ত্রের নয়—স্নায়ুরও বটে। পৃথিবীতে এবিষয়ে কারও বোধ হয় মতদ্বৈধ থাকতে পারে না যে, জাপানের মনোবল যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী; আগামী দিনের দুঃখ-কষ্ট জাপানী স্নায়ু যতটা ভালভাবে সইতে পারবে, আমেরিকান স্নায়ু ততটা কখনও পারবে না।

আমার সমালোচকরা হয়তো এইখানে চুংকিং-চীনের প্রশ্ন তুলে জানতে চাইবেন, পূর্ব্ব-এশিয়ায় মিত্রশক্তির বিজয় কল্পে চুংকিং কি সাহায্য করতে পারে? চুংকিং-এর বাহিনী দীর্ঘকাল ধরে নিপ্পন বাহিনীকে যে বাধা দিচ্ছে তার সামরিক মূল্য কেউ অস্বীকার করবে না, এবং নিপ্পনের জনগণ ও সেনাবাহিনী এত বাস্তববাদী যে তারাও এ সত্যকে অবহেলা করে না। কিন্তু চীনে জাপানের নতুন নীতি এবং চীনের জাতীয় গবর্নমেণ্টের সঙ্গে জাপানের সর্ব্বশেষ চুক্তি সম্পাদনের ফলে চুংকিং-এর নৈতিক ভিত্তি অনেকটা ধ্বসে গেছে। এই চুক্তির ফলে বিরোধের অবসান হলে জাপান চীন থেকে তার সৈন্য সরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে। এই চুক্তির দ্বারা চীনের জনগণ কার্য্যতঃ তাদের সবগুলো দাবীই পূরণ করে নিতে পেরেছে। চুংকিং তবে এখন কিসের জন্যে যুদ্ধ করছে? পূর্ব্ব-এশিয়ায় প্রত্যেকের মনেই আজ এই প্রশ্ন। চীনে জাপানের নতুন নীতির ফল হয়েছে এই যে চীনের জনগণের মধ্যে অনেকেই আজ ভাবতে স্থরু করছে, যে জাপানের সঙ্গে যখন সম্মানজনক শান্তিস্থাপন সম্ভব, তখন বিরোধের অবসান হওয়াই উচিত, এবং জাতীয় পুনঃ-সংস্থাপন ও পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। চীনের জাতীয় গবর্নমেণ্ট জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে যতই এগিয়ে যাচ্ছে, ততই সমগ্র চীনে শান্তির আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে পড়ছে। কাজেই চুংকিং আজ নৈতিক হিসাবে দুর্ব্বল

অবস্থায় পড়েছে। কিছুকাল যাবত চুংকিং-এ যে আভ্যন্তরীণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে এ দুর্ব্বলতা বেড়েই গেছে।

চুংকিং-এর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত কিংবা নিপ্পনের কোন পরিদর্শক বা মন্তব্যকারীর উল্লেখ করব না—আমি উদ্ধৃত করছি একজন আমেরিকান লেখকের মন্তব্য থেকে। কয়েকদিন আগে 'চিকাগো ডেইলী নিউজের' সংবাদদাতা আর্চিবল্ড ষ্টীল তারযোগে জানিয়েছিলেন: "সাত বৎসরের যুদ্ধের স্তূপীকৃত বোঝার নীচে ক্লান্ত চুংকিং যুদ্ধের অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করতে গিয়ে বুঝেছে, এই বৎসরই হবে তার অস্তিত্বের পক্ষে আশঙ্কাজনক। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে চুংকিং খুব বিপদে পড়েছে। গত বৎসর চুংকিং-এর পক্ষে দুঃসময় গেছে—বোধ হয় এ যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুঃসময়। মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করেছিল। অবরোধ এবং অন্যান্য কারণে চুংকিং-বাহিনী ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে।" প্রতিরোধের অবশিষ্ট শক্তি দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনে নিপ্পনের আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—একথার উল্লেখ করে সংবাদদাতা বলেছেন: "জনগণের মনোবৃত্তিতেও যুদ্ধ-ক্লান্তি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।" এর সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, চুংকিং "ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত।"

চুংকিং-এর সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কথা জেনে বিবেচনা করে আমেরিকানরা সর্ব্বপ্রকার কৌশল প্রয়োগ করে চুংকিং-এর মনোবল ধরে রাখার প্রয়াস পাচ্ছে। তারা অবশ্য চুংকিং-এর মার্কিণ-সমর্থক মহলের দ্বারা চুংকিং-চীনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তারা এ আশাও দেখাচ্ছে, শীঘ্রই বর্ম্মা-রোড উন্মুক্ত হবে এবং সেই পথে ভারতের মারফত চুংকিং-এ প্রচুর পরিমাণ সাহায্য পাঠানো হবে। এই আশ্বাস অনুযায়ী ইঙ্গ-মার্কিণরা উত্তর থেকে দক্ষিণে ব্রহ্মের উপর বিরাট অভিযান আরম্ভ করেছিল। এই অভিযানকে বিজ্ঞপিত করা হয়েছিল ব্রহ্ম-পুনরুদ্ধারের অভিযান

বলে। সে অভিযানের আয়ু এখন শেষ হয়ে গেছে; চুংকিং-এর উপর তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা না করে কল্পনাতেই বেশী অনুভব হয়। ইঙ্গ-মার্কিণের আর একটি অপকৌশল, জাপান পরাজিত হলে চীন এশিয়ার প্রবলতম রাষ্ট্রে পরিণত হবে—এ সম্ভাবনাও চুংকিং-এর সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। আসল ব্যাপার কিন্তু এই জাপানের যদি পরাজয়ই হয়, তবে চীন নিশ্চিত আমেরিকার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাবে। যাই হোক্, চুংকিং-এর অবস্থা যদি ভাল থাকত, তবে আমেরিকার কৌশলে কাজ হত। কিন্তু চুংকিং-এর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় এবং চ্যাংসা ও অন্যত্র চুংকিং-বাহিনীর পরাজয়ের ফলে চুংকিং-এর মনোবল ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আমেরিকার প্রচার তাই ফলপ্রসূ হতে পারছে না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে-চুংকিং-এর অবস্থা বর্ত্তমানে এত শোচনীয় এবং ইঙ্গ-মার্কিণদের সাহায্য তার নিজেরই এখন এত দরকার যে, পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের যুদ্ধে সে প্রায় কিছুই সাহায্য করতে পারবে না।

পূর্ব্ব-এশিয়ার এই আলোচনা থেকে আমি নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধান্ত করতে পারি, ইঙ্গ-মার্কিনের পক্ষে জাপানকে পরাজিত করা অসম্ভব। শেষ পর্য্যন্ত জাপানই বিজয়ী হবে। ইউরোপীয় রণাঙ্গনে শেষ পর্য্যন্ত কি ঘটবে না ঘটবে তার উপর ভরসা না রেখেই আমি একথা বলছি।

এখন আমি ভারতের প্রসঙ্গে আসব। এই জটিল ঘটনাবর্ত্তের মধ্যে ভারত কি পেতে পারে—সে সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দেব।

বৃটেনের অতীত ইতিহাস থেকে দেখা যায়, ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়েই শুধু শত্রুর আক্রমণ সম্ভব—এই ধারণার উপর নির্ভর করে বৃটেন চিরকাল ভারতে তদনুরূপ সমর-কৌশল ও সামরিক আয়োজনের ব্যবস্থা করে এসেছে। ভারতের পূর্ব্বদ্বার এখন সহসা উন্মুক্ত হওয়ায়

আমি এর মধ্যে বিধাতার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দেখতে পাচ্ছি—বিশেষ করে যখন ভারতের এই পূর্ব্ব-সীমান্ত-পারে ত্রিশ লক্ষ দেশপ্রেমিক ভারতবাসী বাস করে।

এই ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসীকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে সঙ্ঘবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের নিজেদের যে গবর্নমেণ্ট আছে, সেই গবর্নমেণ্ট পৃথিবীর নয়টি শক্তির দ্বারা লৌকিকভাবে স্বীকৃত। পূর্ব্ব-এশিয়ার প্রত্যেকটি ভারতবাসী একতাবদ্ধ। বৃটিশরা ভারতে সর্ব্বদা যে ধর্ম্মগত ও অন্যান্য বিভেদ উস্কিয়ে দেবার চেষ্টা করে, এদের মধ্যে সে বিভেদ নেই। ভারতের মুক্তি সাধন কল্পে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালানোর জন্যে এরা সামগ্রিক সমরপ্রস্তুতির কার্যক্রম পরিপূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সামগ্রিক সমর-প্রস্তুতি ধন, জন এবং দ্রব্যাদি সম্পর্কিত। তাদের নিজেদের আধুনিক একটি সেনাবাহিনী আছে—যে বাহিনী গত মার্চ্চ মাস থেকে ভারতের মাটির উপর যুদ্ধরত।

একমাত্র প্রশ্ন এই, আজাদ-হিন্দ-ফৌজ জাপানের সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে এবং স্বদেশস্থিত স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের সহায়তায় ভারতে বৃটিশ-শক্তির উচ্ছেদ করতে পারবে কিনা।

আমার উত্তর—"হাঁ, পারবে।"

আমি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তববাদীর মতোই কথা বলছি। আমি ভারতে বৃটিশদের শক্তি জানি। দেশে ভারতীয় জনগণের যে শক্তি আছে, তাও আমি জানি। ইন্দোব্রহ্ম-সীমান্তে এবং ভারতের অভ্যন্তরে মণিপুর ও আসাম অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যদের শক্তি আমি দেখেছি। গত ফেব্রুয়ারী থেকে এই অভিযানে যেসব যুদ্ধবন্দী আমাদের পক্ষে এসেছে তাদের আমি দেখেছি এবং তাদের সঙ্গে কথাও বলেছি। আমাদের যে সব সহকর্ম্মী এবং চর বর্ত্তমানে ভারতের অভ্যন্তরে কাজ করছেন, তাঁদের কাছ থেকেও বিবরণ পেয়েছি। এই সব থেকে

আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি, আমরা বিদেশের অধীনতাপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করতে পারব।

কিন্তু সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী এবং কঠোর হবে। ভারতের মাটিতে সাম্রাজ্যরক্ষার শেষ চেষ্টায় বৃটিশরা প্রাণপণে যুদ্ধ করবে। এ যুদ্ধে এপর্য্যন্ত তারা সেরূপ যুদ্ধ করেনি। কিন্তু আমরা যেরূপ সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করব বৃটিশের বেতনভোগী সেনাদল সেরূপ যুদ্ধ করতে পারবে না—বা করবে না। তা ছাড়া আমাদের মনে মনে এই প্রেরণা আছে, আমরা ন্যায়ের জন্তে সত্যের জন্তে এবং আমাদের জন্ম-স্বত্ব স্বাধীনতার জন্তে যুদ্ধ করছি। আমরা যখন স্বাধীনতার পূর্ণ-মূল্য দিতে প্রস্তুত এবং আমাদের যখন সমরোপযোগী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনী আছে, তখন পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের বিজয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। এবার ভারতবর্ষ মুক্ত হবেই। এই আমাদের অনমনীয় দৃঢ়সংকল্প। ঈশ্বরের ইচ্ছাও তাই।

বেতার-বক্তৃতা : ৯ই জুলাই, ১৯৪৪।

ভারতের অবস্থা

গত কয়েক দিন ধরে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে যা বলে আসছি, আজকে তার সংক্ষিপ্তসার দেব, আর আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রমের পুনরুল্লেখ করব। আমাদের লক্ষ্যের দিকে আমরা এতদূর এগিয়েছি যে চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে আর আমাদের কোন দ্বিধা নেই। এক একটা সময় আসে, যখন পরিকল্পনা গোপন রাখায় নিপুণ সমর-কৌশল প্রকাশ পায় না; হাতের সমস্ত তাস টেবিলের উপর ছড়িয়ে দেওয়াই কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আজকে সেই সময় এসেছে।

ভারতে তিন প্রকারের লোক দেখা যায়। এক প্রকারের আছেন, স্বপ্নেও যাঁরা কোনদিন স্বাধীনতার কথা ভাবতে পারেন না। এঁদের সংখ্যা অতি সামান্য—নগণ্য বললেও চলে, যদিও এঁদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান। এঁদের আমরা স্বচ্ছন্দে অবহেলা করে যেতে পারি। দ্বিতীয় দলে পড়েন, যাঁরা স্বাধীনতা চান এবং অন্তরে অন্তরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করেন। কিন্তু মানবসুলভ দুর্ব্বলতার দরুণ, তাঁরা স্বাধীনতার জন্যে বিশেষ কিছু করেন না—সময় সময় আমাদের কেবল নিষ্ক্রিয় সাহায্য দিয়ে থাকেন। এঁদের বেশীর ভাগ দেখতে পাওয়া যায় সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য চাকুরীজীবীদের মধ্যে। সর্ব্বত্র—স্থূলদৃষ্টি সর্ব্বসাধারণের কাছেও যখন আমাদের বিজয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখনই এঁরা খোলাখুলি ভাবে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের পর এই ধরণের লোক কি ভাবে এগিয়ে এসে নব-বিধানকে সমর্থন করেন, আমি তা স্বচক্ষে ইউরোপে দেখেছি। ক্রোসিয়া,

শ্লোভাকির মতো নতুন স্বাধীন দেশে এবং জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত হবার পর অষ্ট্রিয়ায় আমি এ দৃশ্য দেখেছি। ব্রহ্মদেশেও আমি ভূতপূর্ব্ব আই. সি. এস. ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ এবং সকল বিভাগের ভূতপূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারীরা স্বাধীন-ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের নতুন শাসন-ব্যবস্থায় যোগ দিয়েছেন, এ সব আমি দেখেছি। আমরা প্রত্যাশা করি, ভারতেও এই ধরণের লোকেরা আজাদ-হিন্দ গবর্নমেণ্টকে সমর্থন করবেন। আমরাও তাঁদের গ্রহণ করবো—যদি অবশ্য তাঁদের বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ না থাকে যে বৃটিশ শাসনাধীনে তাঁরা অন্তরে অন্তরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ছিলেন। বস্তুতঃ, আমি এই মর্ম্মে ঘোষণা করতে পারি যে, যাঁরা কর্ম্মনিপুণ ও বর্ত্তমানে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের চাকুরী করছেন—তাঁদের আজাদ-হিন্দ গবর্নমেণ্টও গ্রহণ করবেন—অবশ্য যদি তাঁরা অন্তরে অন্তরে বৃটিশ সমর্থক না হন এবং বৃটিশের অধীনে চাকুরী করার সময় বিপথে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ক্ষতি না করে থাকেন। আর বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর যাঁরা এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় আমাদের পক্ষে এসেছেন কিংবা ভবিষ্যতে আসবেন আজাদ-হিন্দ গবর্নমেণ্ট তাঁদের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই ঘোষণা করেছেন যে আজাদ-হিন্দ ফৌজের অন্যান্য সদস্যদের মতোই তাঁদের প্রতি ব্যবহার করা হবে ; অবসর-গ্রহণের সময় তাঁরা বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীতে যতদিন কাজ করেছিলেন তার সঙ্গে আজাদ-হিন্দ ফৌজে তাঁদের চাকুরী-কাল যোগ দিয়ে—তারই ভিত্তিতে তাঁরা বৃত্তি পাবেন।

তৃতীয় এক প্রকারের লোক আছেন, তাঁরা শুধু স্বাধীনতাকামী নন, স্বাধীনতা-লাভের জন্যে তাঁরা সক্রিয়। প্রধানতঃ তাঁদেরই উদ্দেশ্যে আমি এই বক্তৃতা দিচ্ছি।

স্বাধীনতাকামী ভারতীয়ের পক্ষে স্বাধীনতার পথ কি কি ? প্রথম পথ হচ্ছে, প্রার্থনা ও আবেদনের পথ। এ পথে মনে বিশ্বাস রাখতে হবে

যে যুদ্ধশেষে বৃটিশরা দানস্বরূপ আমাদের স্বাধীনতা দেবে। আমার মনে হয়, এ ধরণের কোন সম্ভাবনাই নেই—আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন কোন ভারতবাসীই একথা আজ আর বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয় পথ হচ্ছে "অপেক্ষা করা এবং দেখা"র নীতি। এ পথেও মনে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতে বৃটিশের অবস্থা এত বেশী সঙ্কটজনক হয়ে উঠবে যে তারা যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুণ আমাদের স্বাধীনতার দাবী পূরণ করতে বাধ্য হবে। এই পথে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের মতানুসারে সময় পূর্ণ হলে স্বাধীনতা পাকা ফলের মতো আমাদের কোলে এসে পড়বে—তার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের বিশেষ কিছু করার নেই। আমার মতে এপথও বর্জ্জনীয়। আমি বহুবার আমার দেশবাসীদের বলেছি, যা-ই ঘটুক না কেন, বৃটিশরা শেষ পর্য্যন্ত ভারতকে আঁকড়ে থাকবে এই সিদ্ধান্ত তারা পাকাপাকি করে রেখেছে। অন্যত্র তাদের অবস্থা যত খারাপ হবে, ভারতকে ততই তারা জোরে আঁকড়ে ধরবে এই জন্য যে ভারতের সাম্রাজ্য যদি কোনমতে বাঁচাতে পারে তবেই বৃটিশ-সাম্রাজ্য বাঁচবে।

তৃতীয় পথ হচ্ছে সত্যাগ্রহ বা আইন-অমান্যের পথে। ১৯২১ থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই পথ অনুসরণ করে আসছে। এপথে আমাদের স্বাধীনতা আসবে কি? আমার সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে, আসবে না। গত কুড়ি বৎসরের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। আমি জানি, ১৯২১ অব্দে কংগ্রেসের অনেকেই বিশ্বাস করতেন, সত্যাগ্রহ কিংবা আইন-অমান্যের পথেই আমাদের স্বরাজ আসবে। দুটি কারণের উপর ভিত্তি করে এই বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল; পরে এ দুটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমতঃ ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, বৃটিশ গবর্নমেণ্টের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, সত্যাগ্রহের চাপে পড়ে বৃটিশরা নিজেদের ভুল দেখতে পাবে—বুঝবে যে, শক্তির দ্বারা

পুরাণো বিধানকে চালু রাখা যাবে না। এবং সেই জন্যে কানাডা ও দক্ষিণ-আফ্রিকায় তারা যেমন করেছিল, তেমনই প্রকৃত রাজনীতিবিদের মতো কাজ করবে। এখন বুঝতে পেরেছি, গবর্ণমেণ্টের হৃদয় বলে কোন পদার্থ থাকে না ; এবং যেখানে হৃদয়ই নেই সেখানে হৃদয়ের পরিবর্ত্তনও সম্ভব নয়। আমরা আরও বুঝেছি যে, অশ্বেত জাতির প্রতি বৃটেনের যে নীতি তার সঙ্গে শ্বেত জাতির প্রতি তার অনুসৃত নীতির বিভিন্নতা আছে। তা ছাড়া বৃটিশরা অনুভব করে, ভারত যদি সাম্রাজ্যের বাইরে চলে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের ভিত্তিও ধ্বসে যাবে ; সাম্রাজ্যের অস্তিত্বই থাকবে না। এমন কি ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দিলেও ভারত শেষ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের বাইরে চলে যাবে। কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ভারতকে সাম্রাজ্যের মধ্যে বেঁধে রাখার জোর নেই ; একবার ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেলেই ভারত সাম্রাজ্যের বাইরে চলে যাবার চেষ্টা করবেই। এ প্রসঙ্গে আয়র্ল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাস বৃটিশ মনোভাব ও মনোবৃত্তির উপর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে—ভারতের অনেকেই এখনও তা অনুধাবন করেন নি। সর্ব্বদলীয় বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌রা যখন ১৯২১-এ ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধি সমর্থন করেছিলেন, তখন তাঁরা ভেবেছিলেন, চিরদিনের মতো আইরিশ সমস্যা মিটে গেল। কিন্তু ১৯৩২ অব্দে প্রেসিডেণ্ট ডি-ভ্যালেরা যখন আইরিশ রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন, তখন আইরিশ সমস্যারও পুনরাবির্ভাব হল এবং নতুন করে সাধারণতন্ত্রের দাবি উঠল। প্রেসিডেণ্ট ডি-ভ্যালেরার ক্ষমতা-প্রাপ্তির পর থেকে বৃটিশরা তাঁকে ক্ষমতাহীন ও শক্তিচ্যুত করবার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস পেয়েছে, কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ডোমিনিয় গবর্ণমেণ্টের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে প্রেসিডেণ্ট ডি ভ্যালেরা এ পর্য্যন্ত বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন এবং ১৯১৬—২১ পর্য্যন্ত বিপ্লবী হিসেবে তিনি যে যুদ্ধ করেছিলেন, তার চেয়ে এ যুদ্ধ হয়েছে বেশী কার্য্যকর। বৃটিশরা তাই

মনে মনে বোঝে যে ভারত আয়র্ল্যাণ্ডের পথই অনুমোদন করবে এবং ভারতকে যা-কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে ভবিষ্যতে সে তা আরও ভালভাবে বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে নিয়োগ করবে। কাজেই যতদিন সম্ভব ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন দমন করাই বৃটিশদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। সত্যাগ্রহ দৈহিক দিক থেকে ভারতে বৃটিশ-শাসনের অবসান ঘটাতে পারে না, কিংবা বৃটিশদের ভারত থেকে বিতাড়িত করতেও পারে না। সত্যাগ্রহ শুধু শান্তির পথে বৃটিশের সঙ্গে সম্মানজনক আপোষ রফার মারফৎ স্বাধীনতা আনতে পারে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পশুশক্তির সাহায্যে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন দমন করতে কৃতসংকল্প হওয়ায় তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই ভারতের মুক্তিকামীর পক্ষে সংগ্রামের ঐতিহাসিক-পদ্ধতি অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর নাই। এইভাবে আমরা চতুর্থ এবং শেষ অপরিহার্য্য পথে এসে পড়লাম— স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে অস্ত্র-গ্রহণ।

ভারতীয় জনগণের একটা বৃহৎ অংশ—বিশেষ করে ভারতীয় যুবসমাজ—এ সম্বন্ধে সজাগ। এই জন্যেই গত চল্লিশ বৎসর ধরে দেশের মধ্যে নানা উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন চলেছে। এই আন্দোলন উপলক্ষে অস্ত্রাদি সংগৃহীত হয়েছে, এবং বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য গোপনে প্রস্তুত করা হয়েছে।

বিপ্লবী আন্দোলনের মারফৎ সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সাহায্যে কিংবা সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতা পাবার কি আশা আছে? অতীত ইতিহাসেই এ প্রশ্নের উত্তর মেলে। অসংহত একদল লোক সামান্য অস্ত্রের দ্বারা পশুশক্তির ভিত্তিতে গঠিত এবং পশুশক্তি ব্যবহারে কৃতসংকল্প একটি বিদেশী গবর্নমেণ্টকে উচ্ছেদ করতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের জন্যে শুধু অস্ত্রের ব্যবহারই যথেষ্ট নয়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন এবং সেই অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজন আধুনিক বাহিনীর।

ভারতের মধ্যেই যদি আধুনিক বাহিনী গঠন এবং ভারতের মধ্য থেকেই সে বাহিনীর জন্যে অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ সম্ভব হত, তবে বাইরে থেকে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হত না এবং ভারতীয় জনগণের পক্ষে তাই হত প্রকৃষ্টতম ব্যবস্থা। কিন্তু ১৮৫৭ অব্দের পরে ভারতীয় জনগণকে যেভাবে নিরস্ত্র করা হয়েছে—তাতে ভারতের মধ্যে কোন বৈপ্লবিক বাহিনী সংগঠন কিংবা তার জন্যে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা অসম্ভব। এর জন্যে হতাশ হয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ করার কোন কারণ নেই। রোগ যত কঠিনই হোক, তার প্রতিষেধক আছে। প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান আছে—শুধু আমাদের আবিষ্কারের প্রতীক্ষা। এক্ষেত্রে প্রতিষেধক হচ্ছে ভারতের বাইরে বাহিনী সংগঠন, সেই বাহিনীর জন্যে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা এবং তারপর দেশের বুকে অভিযান চালানো। পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়রা বর্ত্তমানে তা-ই করছে।

পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়রা যা করছে, ইতিহাসে তার নজির আছে। গত যুদ্ধে আইরিশ সিনফিনদলের বিপ্লবীরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্য পেয়েছিল; তা ছাড়া জার্ম্মাণীর কাছ থেকেও অস্ত্রাদি পেয়েছিল। ১৮৫৯ অব্দে ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইটালী-দখলকারী অষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে তৃতীয় নেপোলিয়ঁর ফরাসী-বাহিনী আহূত হয়েছিল। তুরস্কের শাসন-মুক্তির জন্যে বল্কান যুদ্ধে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সাহায্যে বুলগেরিয়া মুক্তি পেয়েছিল। বস্তুতঃ পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাসে এমন কোন উদাহরণ নেই, যে ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রকারে বাইরের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্ভব হয়েছে।

আমি উপরে মন্তব্য করেছি যে, অহিংস সংগ্রামের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন কখনও সম্ভব হবে না। যদি সেই অলৌকিক ব্যাপার সম্ভবই হয় এবং শুধু সত্যাগ্রহের দ্বারা আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি, তবে

আমার চেয়ে বেশী সুখী কেউ হবে না। সেক্ষেত্রে পূর্ব্ব-এশিয়ায় বর্ত্তমানে আমরা যে সুবৃহৎ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছি, তার আর কোন প্রয়োজনই থাকবে না।

এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, প্রকৃত স্বাধীনতা কামনা করে যাঁরা এত দিন পর্য্যন্ত অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে আসছেন, সর্ব্ব-প্রকার উপায় ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের এই বর্ত্তমান সশস্ত্র সংগ্রামই সমর্থন করা উচিত। আমি জানি, আমাদের যুবক-সমাজের এ বিষয়ে সমর্থন আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু আমাদের প্রবীণ নেতারা কি বলেন? তাঁদেরও এই পথ অবলম্বন করা উচিত। আমাদের প্রধান কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ নেহাৎ হতাশ হয়ে ইতিপূর্ব্বে পরিত্যক্ত মধ্যপন্থী ও উদারনৈতিকদের নীতিতে ও পথে ফিরে যাবার প্রবণতা দেখাচ্ছেন। এটা পরম পরিতাপের বিষয়।

এইবার আমি আমাদের আন্দোলনের কৌশল অতি সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করব। ভারতের বৃটিশ-বাহিনী বাইরে থেকে আক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, তারা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে সক্ষম হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজ সেই হিসাবে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে "দ্বিতীয় রণাঙ্গন" সৃষ্টি করেছে। আমরা যখন ভারতের মধ্যে আরও এগিয়ে যাব এবং ভারতের জনগণ নিজেদের চোখে বৃটিশদের পশ্চাদপসরণ করতে দেখবে, তখন তাদের মনে বিশ্বাস জন্মাবে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন সন্নিকটবর্ত্তী। শুধু তখনই তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে আসবে এবং স্বদেশের মুক্তির জন্যে আমাদের অগ্রসরমান সেনাদলের সঙ্গে হাত মেলাবে। একসঙ্গে আমরা তখন বৃটিশদের পশ্চাদ্ধাবন করব এবং তাদের ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করব।

রাজনৈতিক কিংবা সামরিক—যে কোন কৌশল অনুসারেই কাজ করতে গেলে জনগণের মনস্তত্ত্ব সর্ব্বদাই বুঝতে হয়। যে-কোন সংগ্রামের

পক্ষে এটা মূলীভূত প্রয়োজন। পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতবাসীরা তাদের চোখের সামনে কয়েক মাসের মধ্যে হংকং থেকে চিন্দুইন নদী পর্য্যন্ত একটা বিরাট সাম্রাজ্যকে উবে যেতে দেখেছে। সেই জন্যেই তারা ভারতে বৃটিশদের পরাজয় এবং উচ্ছেদ সম্বন্ধে এত বেশী আস্থাশীল। ভারতস্থিত আমাদের দেশবাসীর এ অভিজ্ঞতা হয়নি। সেইজন্যেই তাদের মনের কোণে ভীতি আছে যে, ভারতে বৃটিশশক্তি হয়তো এখনও এত বেশী যে তাকে কিছুতে পরাজিত করা যাবে না। বিপ্লব আরম্ভের পূর্ব্বে তাদের মন থেকে আমাদের এই ভ্রান্তি দূর করতে হবে। সেই ভ্রান্তি দূর করার জন্যে এবং ভীতিগ্রস্ত ভারতীয়দের মনে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারের জন্যে, আজাদ হিন্দ ফৌজকে যুদ্ধ করতে হবে এবং রক্তপাত করতে হবে। মালয় এবং ব্রহ্মে যেমন ঘটেছিল তেমনইভাবে বৃটিশদের পালাতে বাধ্য করতে পারলে, তবেই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ সমাপ্ত হবে।

আজাদ-হিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক ভূমিকায় এটি এক স্মরণযোগ্য ঘটনা—বৃটিশ-সাম্রাজ্যের এক সমাধিভূমিতে—একদা দুর্ভেদ্য দুর্গ সিঙ্গাপুরে এই বাহিনীর সংগঠন হয়েছে। আজাদ-হিন্দ ফৌজ এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যাত্রা সুরু করেছে যে, নিয়তি ইতিপূর্ব্বেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন; আজাদ-হিন্দ ফৌজ সেই দণ্ডদানের ব্যাপারে নিমিত্ত মাত্র।

প্রশ্ন ওঠে,—আমাদের এ সংগ্রামে জাপানের সাহায্য প্রয়োজনীয় কেন। আয়র্ল্যাণ্ডে বৃটিশদের পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আইরিশ সিনফিন দলের খুব বেশী হলে মাত্র পাঁচ হাজার অনিয়মিত সৈন্য ছিল। ইটালীতে গ্যারিবল্ডী তাঁর সামরিক অভিযান সুরু করেছিলেন মাত্র এক হাজার অসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে। তবে আমাদের জাপানের সাহায্য প্রয়োজন হয়েছে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট। যদি ভারতের যুদ্ধপূর্ব্ব বৃটিশ-বাহিনীর

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হত, তবে আমাদের কোন বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন হত না। কিন্তু এই যুদ্ধ উপলক্ষে বৃটিশ আমাদের দেশে এক বিরাট সেনাবাহিনী তৈরী করেছে। তাছাড়া, তারা সারা পৃথিবী থেকে অতিরিক্ত সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র এবং সমর-সজ্জা এনেছে—ইংল্যাণ্ড থেকে, আমেরিকা থেকে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এবং নেপাল থেকে। একদা সর্ব্বশক্তিমান বৃটিশরা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছে। সেই জন্যে আমাদেরও জাপানের সাহায্য নিতে হয়েছে। ভারতের বৃটিশ বাহিনী তার যুদ্ধ-পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরে যাক; আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, জাপানের সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্য ছাড়াও আমরা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধন করতে পারব। আর বৃটিশরা যদি মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, একটি জাপানী সৈন্যও ভবিষ্যতে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করবে না, এবং যে সব জাপানী সৈন্য ইতিমধ্যেই ভারতে পৌঁছেচে তারা সানন্দে এখনই ভারত ছেড়ে চলে আসবে।

আমাদের সমগ্র অভিযান কৌশলের বর্ণনা দিয়ে, এবার আমি প্রকাশ করব, চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে আমি কেন এত আস্থাশীল—

১। আমি দেখছি ইতিহাসের বিধান অনুসারে বৃটিশ সাম্রাজ্য এখন ক্ষয়িষ্ণু। কোন প্রকার কৃত্রিম উত্তেজক দ্রব্যের দ্বারা—যেমন আমেরিকান সাহায্যের দ্বারা—তাকে আর পূর্ব্বেকার যৌবন এবং গৌরবের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।

কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্য অকস্মাৎ মরে না। মৃত্যু যখন এগিয়ে আসে, তখনও সংগ্রাম চলে—মৃত্যুর কাছে শেষ আত্মসমর্পণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময় সময় সে সংগ্রাম অতি কঠিনও হয়। এই জন্যেই বৃটিশরা এখনও যুদ্ধ করছে এবং ভবিষ্যতে পতনের পূর্ব্বে তারা কঠিন সংগ্রাম করবে।

২। ভারতীয় জনগণ এখন যথেষ্ট এগিয়ে গেছে; তারা নিজেদের ব্যাপারে কর্তৃত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ সক্ষম। এজন্তে তারা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছে।

৩। আমি দেখছি, দেশব্যাপী জাতীয় জাগরণ হয়েছে এবং স্বাধীনতা লাভের জন্তে যে নিগ্রহ ও আত্মত্যাগ প্রয়োজন তার জন্তেও জনগণ প্রস্তুত। তাছাড়া, রাজনৈতিক দিক থেকে দেশবাসী সঙ্ঘবদ্ধ এবং নিয়মানুবর্ত্তী।

৪। এপর্য্যন্ত আমাদের যে একটি জিনিসের অভাব ছিল—একটি মুক্তি-ফৌজ—তারও জন্ম হয়েছে।

৫। ভারতের মুক্তির জন্তে বাইরের যে সামরিক সাহায্য অপরিহার্য্য, ভারতের পূর্ব্বদ্বার খুলে যাওয়ায় এবং পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের প্রবল প্রচেষ্টার ফলে—সেটা পাওয়াও আজ সম্ভব হয়েছে।

৬। যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুণ বৃটিশ শক্তির উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারত-রক্ষার অয়োজন পণ্ড হয়ে গেছে। ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক কারণে পূর্ব্বদিক থেকে ভারতে অভিযান করা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক, কিন্তু বৃটেনের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক।

৭। ভারতের অভ্যন্তরে আমাদের অভিযান চালানোর জন্তে আমরা পূর্ব্ব-এশিয়ায় একটি শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলতে পেরেছি। লোকবল, ধনবল এবং দ্রব্যবলের দিক থেকে সামগ্রিক সমর-প্রস্তুতির মারফৎ পূর্ব্ব-এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একটা ভয়ঙ্কর শক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। যতদিন প্রয়োজন ততদিন তারা ভারতের অভ্যন্তরে আমাদের অভিযান পরিচালনায় কার্য্যকরী সাহায্য করতে পারবে।

৮। সঙ্কট উপস্থিত হলে জাপানের মতো একটি প্রথম শ্রেণীর আধুনিক শক্তির সাহায্য আমরা পেতে পারি—বিশেষ করে যদি ভারতের সম্মিলিত মিত্রশক্তি আমাদের পক্ষে খুব বেশী শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়।

৯। আমরা যখন ব্রহ্ম থেকে ভারতে অগ্রসর হব, তখন পিছন থেকে চুংকিং আমাদের আঘাত করতে পারবে—এরূপ কোন আশঙ্কা নেই।

১০। আমাদের নেতৃত্বভার নিজেদের এমন একটি গবর্নমেণ্টের উপর, যার পিছনে নয়টি মিত্রশক্তির স্বীকৃতি ও সমর্থন আছে।

১১। সাধারণ যুদ্ধ-পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল; আমরা ইউরোপীয় যুদ্ধের উপর নির্ভরশীল নই। ভবিষ্যতে ইউরোপে যাই ঘটুক না কেন, আমরা জয়লাভ করবই।

সর্ব্বশেষ হলেও এটা কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, আমরা বিপক্ষীয়দের এবং নিজেদের শক্তির তারতম্য জানি। আমরা ন্যায় সত্য এবং জন্মস্বত্ব স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছি—এ চেতনা আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। মিত্রশক্তির মনে সেরূপ কোন প্রেরণা নেই। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য যে সঙ্কল্প আমরা করেছি, তা অনমনীয়। তা ছাড়া, আমরা নিজেদের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার পূর্ণ মূল্য দিতে প্রস্তুত।

বক্তৃতা শেষ করার পূর্ব্বে বর্ত্তমানে ইন্দোব্রহ্ম-সীমান্তে এবং ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। এই অভিযান সম্বন্ধে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, এর ফলে বৃটিশরা ব্রহ্ম পুনরুদ্ধারের সমস্ত পরিকল্পনা চিরদিনের মতো শিকেয় তুলতে বাধ্য হয়েছে। নিজেদের মুখ রক্ষার জন্যে বৃটিশরা এখন বলছে যে, আমরা দিল্লী পৌঁছুতে পারি নি। তারা আমাদের দিল্লী প্রবেশের কাল্পনিক তারিখ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করছে।

বন্ধুগণ! শত্রুর শক্তি যে কম করে দেখবে সে মূর্খ। আরাকানে, কালাদন ও হাকা অঞ্চলে, টিড্ডিম অঞ্চলে, মণিপুর এবং আসামে বিপক্ষীয়দের বহু বিমিশ্র বাহিনী আমরা দেখেছি। আমরা বহু আগেই যা ভেবে রেখেছি তাই সত্যি। আমাদের চেয়ে তাদের রেশন বেশী, সমরসজ্জা উন্নত ধরণের; কেন না তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ভারতবর্ষের সম্পদ জড় করছে। তা সত্ত্বেও আমরা সর্ব্বত্র তাদের পরাজিত

করেছি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিপ্লবীবাহিনীকে আমাদের মতো অবস্থাতেই যুদ্ধ করতে হয়—কিন্তু তারা শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী হয়। বিয়ার এবং রাম, টিনজাত শূকর-মাংস এবং গো-মাংস থেকে তাদের শক্তি আসে না, তাদের শক্তি আসে বিশ্বাস এবং আত্মত্যাগ থেকে—সাহস এবং সহিষ্ণুতা থেকে। আজাদ-হিন্দ ফৌজ বৃটিশ-বাহিনীর মতো নয়। চূড়ান্ত রকমের কষ্ট এবং অসুবিধার মধ্যে যুদ্ধ করার জন্যে আজাদ-হিন্দ ফৌজকে গড়ে তোলা হয়েছে। যাদের মুক্তির জন্যে তারা সংগ্রাম করছে, সেই বিশ কোটি আশি লক্ষ লোকের স্বার্থকে তারা কখনও ডুবিয়ে দেবে না।

মণিপুর এবং উত্তর-পূর্ব্ব আসামের সামরিক গুরুত্ব এত বেশী যে, বৃটিশরা সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই দৃঢ় প্রতিরোধ করবে। উভয় পক্ষই জানে যে, মণিপুর মুক্ত হলেই বৃটিশদের একটা বিরাট অঞ্চল ছেড়ে বহু দূর পশ্চাদপসরণ করতে হবে। কিন্তু আমরা ভারতের অভ্যন্তরে অভিযান-পরিচালনায় অভিজ্ঞতার পূর্ণতম ব্যবহার করছি। দীর্ঘস্থায়ী কঠিন সংগ্রাম আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক—কেন না একমাত্র এই পথেই নতুন বিপ্লবী বাহিনী এবং তার অফিসারদের শিক্ষা লাভ সম্পূর্ণ হতে পারে। আমরা শুধু এখন ভারতকে মুক্ত করলেই কাজ ফুরিয়ে যাবে না,—আমাদের সেনাবাহিনী, অফিসার এবং সেনাপতি তৈরী করতে হবে—যারা ভবিষ্যতে সব সময়ের জন্যে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে। কাজেই, এখন মণিপুরে এবং আসামে যা ঘটছে তা আমাদের মঙ্গলের জন্যেই।

ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে, সে যুদ্ধ বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ নয়—এ ভারতের নিজেরই মুক্তি-সংগ্রাম। সেই জন্যেই আমরা অধৈর্য্য কিংবা দুর্ব্বল হয়ে পড়িনি। মণিপুর থেকে দিল্লী অনেক দূর। কাজেই রাজধানীতে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করতে পারার পূর্ব্বে আমরা পুরো দুটি বৎসর যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আমরা জানি,

সংগ্রাম যত দীর্ঘ স্থায়ী এবং কঠিনই হোক, শেষ পর্যন্ত আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। ইত্যবসরে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯৪২-এ ভারত ছেড়ে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, তারা আরও কিছুদিন সুখভোগ করে নিক। চরম দিনে নয়া দিল্লীর বড়লাটের প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘোষণা করা হবে।

বেতার বক্তৃতা : ১০ই জুলাই, ১৯৪৪

বাহাদুর শাহের সমাধি-ক্ষেত্রে

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামে অর্থাৎ ১৮৫৭ অব্দের বিপ্লবে যিনি আমাদের নেতা ছিলেন, সেই সম্রাট বাহাদুর শাহের স্মৃতিস্তম্ভের নিচে এইখানে আমরা গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ করেছিলাম। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে গত বৎসরের সে উৎসবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল; আজাদ-হিন্দ বাহিনীর যে সব দল তখন এখানে ছিল, তারা কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করেছিল।

উৎসব ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল একথা আমি বলছি এই জন্যে যে ১৮৫৭ অব্দের পর ভারতের নূতন বিপ্লবী বাহিনী সেই প্রথম ভারতের প্রথম বিপ্লবী বাহিনীর অধিনায়কের আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাল। গত সেপ্টেম্বরের কুচকাওয়াজে আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম, সবাই শপথ গ্রহণ করেছি, সম্রাট বাহাদুর শাহের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে হবে; বৃটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে হবে। আজকে আনন্দ ও গর্ব্বের সঙ্গে আমি বলতে পারছি, আংশিকভাবে আমরা সে শপথের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পেরেছি। সেদিন সেনাবাহিনীর যাঁরা এ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই এখন রণাঙ্গণে যুদ্ধ-রত। ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করে আজাদ-হিন্দ ফৌজ এখন মাতৃভূমির মাটির উপর লড়াই করছে।

এ বৎসর একটা দৈবনির্দ্দিষ্ট যোগাযোগ ঘটেছে—সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যুবার্ষিকী এবং নেতাজী সপ্তাহ একই সময় পড়েছে। এই সময়ে সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়রা স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম

চালিয়ে যেতে নতুন করে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ভারতের প্রথম মুক্তি-সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি যে স্থানে তাঁর দেহ রক্ষা করেছিলেন, সেই স্থানই আজ ভারতের শেষ মুক্তি-যুদ্ধের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে—এর মধ্যেও আমি দৈবের অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দেখতে পাচ্ছি। এই পবিত্র স্থান থেকে আমাদের সৈন্যরা আজ মাতৃভূমির দিকে এগিয়ে চলেছে। আজাদ-হিন্দ ফৌজের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ উপলক্ষে তাই আমরা এখানেই পুনর্মিলিত হয়েছি—সেই মহান দেশপ্রেমিক ও নেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, আমাদের গত বৎসরের প্রতিশ্রুতির আংশিক পরিপূরণে আনন্দ প্রকাশ করতে এবং অবাঞ্ছিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে মুক্ত না করতে পারা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সঙ্কল্প পুনর্গ্রহণ করতে।

১৮৫৭ অব্দের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কিছু বলা আমার কর্ত্তব্য। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা প্রচার করেছেন, ১৮৫৭ অব্দের যুদ্ধ বৃটিশের অধীনস্থ ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নয়। এ বিবরণ সত্য নয়। বস্তুতঃ ১৮৫৭ অব্দের বিপ্লব জাতীয় বিপ্লব; তাতে ভারতীয় সৈন্যরা এবং অসামরিক অধিবাসীরা অংশ গ্রহণ করেছিল। ভারতের দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে অনেকে সেই দেশব্যাপী বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন—যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের কেউ কেউ এর থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেনও। সেই যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় আমরা বিজয়ের পর বিজয় লাভ করেছিলাম; শুধু শেষের দিকেই আমরা শক্তিহীন হয়ে পরাজিত হয়েছিলাম। বিপ্লবের ইতিহাসে এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বিপ্লবের উদাহরণ খুব কমই দেখা যায়, যেক্ষেত্রে প্রথম সংগ্রামেই সাফল্য লাভ হয়েছে। "স্বাধীনতার যুদ্ধ একবার সুরু হলে সব সময় পিতার থেকে পুত্রের হাতে তার উত্তরাধিকার চলে আসে।" বিপ্লব সাময়িকভাবে ব্যর্থ ও দমিত হলেও পশ্চাতে সে তার শিক্ষা রেখে যায়।

পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা সেই সব শিক্ষা লাভ করে এবং উন্নততর আয়োজন করে আরও কার্য্যকরী উপায়ে নূতনভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করে। আমরা ১৮৫৭ অব্দের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা লাভ করেছি, এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এই সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়েছি। এই সংগ্রামই ভারতের শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

১৮৫৭ অব্দে ভারতীয় জনগণ হঠাৎ একদিন বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করল—এমন কথা মনে করলে ভুল করা হবে। এমন আকস্মিক রূপে কোন বিপ্লবই অনুষ্ঠিত হয় না। ১৮৫৭ অব্দে আমাদের নেতারা যুদ্ধের জন্যে সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করার প্রাণপণ প্রয়াস পেয়েছিলেন—যদিও পরে দেখা গেল, তাঁদের সে আয়োজন যথেষ্ট ছিল না। উদাহরণ-স্বরূপ ধরুন, নানা সাহেবের কথা—যিনি সেই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান নায়ক। তিনি বিদেশ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পাবার আশায় সারা ইউরোপে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮৫৭ অব্দে যখন বিপ্লব আরম্ভ হল, তখন বৃটেনের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের মৈত্রী-সম্পর্ক ছিল এবং বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্যে বৃটিশ সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করতে পেরেছিল।

ভারতের অভ্যন্তরে জনগণ ও সৈন্যদের মধ্যে কিছুকাল বিচক্ষণতা ও কৌশলের সঙ্গে প্রচারকার্য্য চালানো হয়েছিল। ফলে, বিপ্লবের ইঙ্গিত দেওয়া মাত্রই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একই সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হল। বিজয়ের পর বিজয় লাভ করা হল। উত্তর-ভারতের উল্লেখযোগ্য সব সহর বৃটিশদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল এবং বিপ্লবী সৈন্যদল সগৌরবে ভারতের রাজধানীতে প্রবেশ করল। অভিযানের প্রথম পর্য্যায়ে বিপ্লবীরা প্রায় সর্ব্বত্রই বিজয় লাভ করল। অভিযানের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বৃটিশ যখন প্রত্যাক্রমণ সুরু করল, তখন আমাদের লোকেরা আত্মরক্ষা করতে পারল না। তখন বিপ্লবীদের দেশব্যাপী সমর-কৌশল দেখা গেল;

কিন্তু সে সমর কৌশলের সমন্বয়-সাধনের জন্যে তেজস্বী নেতার অভাব হল। তা ছাড়া, কোন কোন অঞ্চলে দেশীয় নৃপতিরা নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন হয়ে রইলেন। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বাহাদুর শাহ্ জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, আলোয়ার প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের কাছে নিম্নলিখিতরূপ পত্র লিখেছিলেন :—

"সর্ব্বপ্রকারে এবং যে কোন মূল্যে ইংরেজদের হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়িত হতে দেখাই আমার একাগ্র ইচ্ছা। আমার একান্ত ইচ্ছা, সমগ্র হিন্দুস্থান যেন স্বাধীন হয়। এই উদ্দেশ্যে যে বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে তা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না— যদি এমন কোন লোক এসে না দাঁড়ান যিনি জাতির বিভিন্ন শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংহত করতে পারেন, সমস্ত আন্দোলনের ঝুঁকি নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারেন এবং সমগ্র জনসমাজকে নিজের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে এই আন্দোলনকে চালিয়ে নিতে পারেন। ইংরেজ-বিতাড়নের পর নিজ লাভের জন্যে ভারত-শাসনের কোন ইচ্ছাই আমার মনে নেই। আপনারা সমস্ত রাজা যদি স্বাধীনতার জন্যে অসি কোষমুক্ত করতে প্রস্তুত থাকেন, তবে আমি সম্রাটের ক্ষমতা ত্যাগ করে নির্ব্বাচিত ভারতীয় রাজাদের একটি সঙ্ঘের হাতে শাসন-শক্তি ন্যস্ত করতে সম্মত আছি।"

বাহাদুর শাহের নিজহাতে লেখা এই চিঠির মধ্যে যে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের প্রকাশ পেয়েছে তার সামনে স্বাধীনতাকামী ভারতীয় মাত্রেরই শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে।

বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল বাহাদুর শাহ্ অনুভব করেছিলেন, নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কাজেই তিনি সমগ্র অভিযান পরিচালনার জন্যে ছয় জনের একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটিতে ছিলেন তিনজন সেনাপতি এবং তিনজন অসামরিক ব্যক্তি।

কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল—হয়তো তখন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সময় সমাগত হয়নি বলেই।

এই প্রবীণ নেতার মধ্যে যে বিপ্লবী মনোবৃত্তি ও অনুপ্রেরণা ছিল, আর একটি ঘটনা থেকেও তার প্রমাণ মেলে। যুক্তপ্রদেশে বেরিলির দেওয়ালে দেওয়ালে যে রাজ-ঘোষণা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে বাহাদুর শাহ্ বলেছিলেন :—

"আমাদের সেনাবাহিনীতে ছোট এবং বড়র ভেদাভেদ ভুলে যাওয়া হবে; সমতাই হবে নিয়ম। এই পবিত্র যুদ্ধে যারা অস্ত্র-ধারণ করেছে, তারা সবাই সমান গৌরবের অধিকারী। তারা সবাই ভাই ভাই—তাদের মধ্যে পদমর্য্যাদার বিভেদ নেই। ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট আমি আমার নিবেদন জানাচ্ছি—ওঠ, এই দৈবনির্দ্দিষ্ট মহৎ কর্ত্তব্য পালনের জন্যে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়।"

এসব ঘটনার উল্লেখ করে আমি এই কথা প্রমাণ করতে চাই যে, আমাদের এই আজাদ-হিন্দ ফৌজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুদূর ১৮৫৭ অব্দে। এই শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমাদের সামনে আছে ১৮৫৭ অব্দের প্রথম সংগ্রামের শিক্ষা এবং তার ব্যর্থতার শিক্ষা।

এবার নিয়তি আমাদের পক্ষে। কয়েকটি রণাঙ্গনে আমাদের বিপক্ষীয়রা জীবন-মরণ সংগ্রামে নিযুক্ত। স্বদেশে আমাদের দেশবাসীরাও সম্পূর্ণ সজাগ। আজাদ-হিন্দ ফৌজের শক্তি অমোঘ; এই সেনাবাহিনীর সকল সদস্য নিজ দেশকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ। পূর্ণ বিজয় লাভ না করা পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো সাধারণ সমর-কৌশল আমাদের আছে। আমাদের ঘাঁটি যথোচিত ভাবে সুসংবদ্ধ। এই বীর-কার্য্যে অনুপ্রেরণা জোগানোর জন্যে রয়েছে মহিমময় বাহাদুর শাহের স্মৃতি এবং আদর্শ। শেষ বিজয় আমাদের হবেই, এতে সন্দেহ থাকতে পারে না।

১৮৫৭ অব্দের ঘটনাবলী যখন আমি পড়ি এবং বিপ্লবের ব্যর্থতার পর বৃটিশরা যে ব্যবহার করেছিল তার কথা যখন আমি ভাবি, তখন আমার রক্তে যেন আগুন ধরে যায়। শুধু যুদ্ধকালেই নয়, তার পরেও নির্দোষ স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের রক্তপাত হয়েছে; অমানুষিক ভাবে তারা নির্য্যাতিত হয়েছে। তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দেশবাসীরা অতিমানব-সুলভ সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় দেবে এটা যদি আপনাদের কাম্য হয়, তবে তাদের শুধু দেশকে ভালবাসতে শিখলেই চলবে না, বিপক্ষীয়দের নিষ্ঠুরতাও স্মরণ রাখতে হবে।

আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা হচ্ছে রক্তদান। এই যুদ্ধে আমাদের বীরদের রক্তদান আমাদের অতীত পাপকে ধুয়ে মুছে দেবে। আমাদের স্বাধীনতার মূল্য হবে বীরদের রক্তপাত। ভারতের জনগণ অত্যাচারীদের উপর যে প্রতিশোধ নিতে চায়, আমাদের বীরদের রক্ত—তাদের বীরত্ব এবং তাদের সাহস—সেই প্রতিশোধ-গ্রহণের ব্যবস্থা করবে।

পরাজয়ের পরে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্ এই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন:

"গাজীয়োঁ মেঁ বু রহেগি, যব তলক ইমানকি
থক্তে লণ্ডন তক্ চলেগি, থেগ হিন্দুস্থান কি।"

"যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের স্বাধীনতার সৈনিকদের হৃদয়ে বিশ্বাস থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের খড়্গ লণ্ডনের হৃদয় বিদ্ধ করবে।" তিনি ঠিকই বলেছিলেন। ভারতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান হয়ে যাবে।

সম্রাট বাহাদুর শাহের স্মৃতিস্তম্ভের নিচে আনুষ্ঠানিক কুচ-কাওয়াজ উপলক্ষে: ১১ই জুলাই, ১৯৪৪

মিথ্যা প্রচার

পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমাদের এক বৎসরের কার্য্যাবলী, আমাদের কৃতিত্ব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিশদভাবে বলেছি। বৃহত্তম জাতীয় বিপ্লবে নিজ সমর-কৌশল কিংবা অভিযানের পরিকল্পনাও গোপন রাখার প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় জনগণকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসার উপরই আমাদের পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে। কাজেই আমাদের পক্ষে ধাপ্পাবাজির খেলা আত্মহত্যারই সামিল। আমরা শুধু খোলাখুলি স্পষ্ট নীতির দ্বারাই দেশবাসীদের প্রভাবিত করতে পারি। আমাদের জন্মস্বত্ব স্বাধীনতার জন্যে আমরা যুদ্ধ করছি। সে সম্বন্ধে আমাদের বিপক্ষদলেরও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আমরা জানি, সাধারণ ভারতীয় জনগণ হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে আমাদের জন্যে সহানুভূতি পোষণ করেন। যে প্রশ্ন তাঁদের চিন্তিত করে তোলে, সে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী সাফল্যলাভ করতে পারব কিনা। সে সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসংশয় হলেই সোজাসুজি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসবেন। বিদেশীর দাসত্বের ফলে অনেকেই স্বভাবতঃ ভীরু-হৃদয়; সংগ্রামের চূড়ান্ত ফলাফল সম্বন্ধে সংশয় থাকা পর্য্যন্ত তাঁরা নিজেদের বিপন্ন করতে দ্বিধাবোধ করবেন।

বিপক্ষদলের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের দেশ এবং জনগণের উপর প্রভুত্ব করা এবং তাদের শোষণ করার পিছনে কোন নৈতিক সমর্থন নেই। কাজেই তারা ধাপ্পাবাজি, প্রতারণা এবং পশু-শক্তির অস্ত্র ব্যবহার করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতে প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার

জন্যে সম্ভাব্য সব পথই অবলম্বন করবে—এ আমি জানি; এর জন্য আমি বিস্মিত নই। যা আমাকে বিস্মিত করে ও ব্যথা দেয় তা হচ্ছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে জঘণ্য কাজ করতে পারে, সে কাজ করার জন্যে বৃটিশ বেতনভোগী আমার কোন কোন দেশবাসী স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে। মাসে কয়েকটি মুদ্রার জন্যে আমার দেশবাসী নিজেদের এমন ঘৃণ্যভাবে বিকিয়ে দেবে কেন? গত যুদ্ধে ইংরেজরা যে প্রচার-প্রদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, তার ইতিহাস ইংরেজরাই কাগজে কলমে লিখে রেখে গেছে। বৃটিশ প্রচারকরা কি করতে পারে না পারে, তার ইতিহাস জানতে হলে পমসেনবি-র লেখা "Secrets of Crewe House" এবং "Wortime Falsehoods"-এর মতো বই পড়লেই যথেষ্ট। একজন ইংরেজ সেনাপতি—ব্রিগেডিয়ার চার্টেরিসই গত যুদ্ধে এই গুজব রটিয়েছিলেন, জার্ম্মানরা মৃত সৈন্যদের দেহ থেকে চর্ব্বি বের করে নিচ্ছে। তিনি জানতেন, এটা ডাহা মিথ্যা। যুদ্ধের শেষে তিনি স্বীকারও করেছিলেন যে, তাঁর এই প্রচার লোকের মনে এমন দৃঢ়মূল হবে এ তিনি প্রত্যাশা করেন নি। কিন্তু বিশ্বের জনসাধারণের সহজ-বিশ্বাসী একটা অংশ মনে করেছিল, একজন বৃটিশ সেনাপতি মিথ্যা কথা বলতেই পারে না। তাই এ অপকৌশলে কাজ হয়েছিল। তারপর বহু পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। জনসাধারণ আজ আর অত সহজ-বিশ্বাসী নয়। বেতারের দৌলতে উভয় পক্ষের প্রচারই পৃথিবীর সকল জায়গায় পৌছুতে পারে। তা সত্ত্বেও চিতাবাঘ তার গায়ের দাগ বদলাতে পারে না। মিথ্যাবাদী যদি জানেও যে তার কথায় কেউ বিশ্বাস করে না, তবু সে মিথ্যা কথা বলা বন্ধ করতে পারে না। আশা না থাকলেও সে আশা করে যে, দুনিয়ায় এমন অনেক বোকা আছে, যাদের উপর মিথ্যাপ্রচারের ফল ফলবে। বিরুদ্ধ পক্ষ তাই এত মিথ্যা ও ধাপ্পাবাজির জাল ফেলে চলেছে। এতে আমি বিস্মিত নই। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে,

ভারতে ভাড়াটে প্রচারকরা তাদের হয়ে এই নোংরা কাজ করে। আমি জানি, ভারতে একটা প্রবল অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা চলেছে, এবং জনগণ অনশন ভোগ করছে। কিন্তু তা বলে এটা কখনো উচিত নয়, শিক্ষিত লোকেরা এবং সময় সময় নারীরাও এগিয়ে এসে সস্তায় আত্মবিক্রয় করবেন। কোন কোন সময়ে আমি উচ্চ ডিগ্রিধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও ভারত-বিরোধী রেডিওর প্রচার-কেন্দ্র থেকে মিথ্যা প্রচার করতে শুনেছি।

একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বিপক্ষীয়দের মিথ্যা প্রচার প্রমাণিত করছি। ভারত-বিরোধী রেডিও একাধিকার বলছে, ভারতে আমি এত অপ্রিয় ছিলাম যে, জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলাম এবং দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। ভারতে কে না জানে, যে ১৯৩৯-এর জানুয়ারী মাসে মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহেরুর বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি ভোটের সংখ্যাধিক্যে কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে পুনর্নির্ব্বাচিত হয়েছিলাম? কে না জানে, আমি যদি পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিকে পুনরায় মনোনীত করতাম, তবে মহাত্মা গান্ধীর সমর্থনে আমি আর একবৎসরের জন্যে সহজেই প্রেসিডেণ্ট থেকে যেতে পারতাম? গান্ধীজী ও আমার মধ্যে বিরোধ বেধেছিল এইনিয়ে যে, পুনর্নির্ব্বাচনের পর আমি নিজের ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়নের অধিকার চেয়েছিলাম। আমার পক্ষে দেশে থাকা কিংবা কারাগারে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে থাকা ছিল সহজতম ব্যাপার। ভারতে কে না জানে যে, বৃটিশদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে ছিল সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং সবচেয়ে বেশী বিপদসঙ্কুল ব্যাপার? ভারত-বিরোধী রেডিও এ কথা জানে কি জানে না যে, আমার পলায়নে বাধা দিতে পারে নি বলে কয়েকজন পুলিশ অফিসারের চাকুরী গেছে? ভারত বিরোধী রেডিও জানে কিম্বা জানে না যে আমাকে ধরার জন্যে এবং ধরতে না

পারলে হত্যা করার জন্যে গুপ্তচরদের আমার পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

অন্যধরণের প্রচারও আছে যা সমান ঘৃণ্য না হলেও সমান মিথ্যা; উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, ১৯৪৩ সালে বিশ্ব-পরিভ্রমণ করে আমি যখন টোকিও পৌছেছিলাম, বৃটিশদের মুখরক্ষার জন্যে তখন ভারত-বিরোধী রেডিও বলতে বাধ্য হয়েছিল—একবার নয়, বহুবার—যে, জার্ম্মান-গবর্নমেণ্টের সঙ্গে আমার মতভেদ হওয়ায় আমি ইউরোপ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। এই মিথ্যার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হল, যখন পূর্ব্ব-এশিয়ার আজাদ হিন্দ সাময়িক গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পর জার্ম্মান গবর্নমেণ্ট তাকে পরিপূর্ণ সমর্থন করলেন, এবং গবর্নমেণ্টের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সরকারী বাণী পাঠালেন। সম্প্রতি লর্ড লুই মাউণ্ট ব্যাটেনের ব্রহ্ম পুনরুদ্ধারের ব্যর্থতা এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের অগ্রগতিতে বাধা-দানের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে ভারত-বিরোধী রেডিও আমার সঙ্গে জাপানী গবর্ণমেণ্টের মতবিরোধের কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করছে; বলছে যে, আমাদের সৈন্য ভারতে প্রবেশ করার পর দেশে কোন বিপ্লব হয় নি বলে জাপানী গবর্ণমেণ্ট আমার বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে। ভারতে যে কেউ আমার বেতার-বক্তৃতা শুনে থাকেন তিনিই জানেন, আমি দেশবাসীদের বরাবর এই বলে সতর্ক করে আসছি যে আমরা নির্দ্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁদের বিপ্লব কিংবা বৃহদায়তনের কোন নাশকতামূলক কাজ করা উচিত হবে না। নিতান্ত গণ্ডমূর্খও বুঝতে পারবে, আমাদের সেনাদল ভারতের মধ্যে বেশ কিছুদূর প্রবেশ করে বিপ্লবকারীদের সাহায্যদানের অবস্থা সৃষ্টি না করা পর্য্যন্ত দেশবাসীর পক্ষে বিপ্লব কিংবা বিপুলায়তনে নাশকতামূলক কাজের চেষ্টা করা হবে আত্মহত্যারই সামিল। আমি আবার বলছি, এই সব প্রচার-কৌশল আমাকে আদৌ বিস্মিত করে না। যারা আমাকে হত্যা করাতে

পারলে খুশী হত, তাদের পক্ষে এই প্রকার প্রচারের অর্থ অবোধ্য নয়।

কিন্তু যে বিষয়টি বিস্ময়কর অপমানজনক তা হচ্ছে, এই ১৯৪৪ অব্দেও এমন ভারতীয় পাওয়া যাচ্ছে যারা সামান্য অর্থের জন্যে আত্মবিক্রয় করে সব রকম নোংরা কাজ করে। বৃটিশরা যে আমাকে মনের সুখে গালাগালি করবে—আমাকে 'কুইস্‌লিং' "পুতুল' প্রভৃতি বলবে—এ তো স্বাভাবিকই। কিন্তু মিথ্যা প্রচারকার্য্যের জন্যে এখনও তারা মিরজাফর ও উমিচাঁদদের পাবে কেন? এমন কোন ভারতবাসীই নেই যে বিশ্বাস করবে, আমি জাপানী কিংবা অন্য কোন বিদেশী শক্তির কাছে নিজেকে এবং আমার দেশকে বিক্রী করতে পারি।

বৃটিশের ভাড়াটে ভারতীয় প্রচারকরা আর একটি কুকাজ করছে—সেটি হচ্ছে, জাপানী নৃশংসতা সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচারকার্য্য—বিশেষ করে, ভারতীয়দের উপর জাপানীদের নৃশংস অত্যাচারের কথা। কোন ভারতবাসী কি বিশ্বাস করতে পারে, পূর্ব্ব-এশিয়ার কোথাও আমার দেশবাসীদের সঙ্গে জাপানীরা যদি কুব্যবহার করত, তবে আমি এবং পূর্ব্ব-এশিয়াস্থ আমার দেশবাসীরা জাপানীদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতাম এবং তাদের সেনাদলের সঙ্গে পাশাপাশি যুদ্ধ করতাম? জাপান যখন নিজের পথ থেকে সরে এসে ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন সর্ব্বপ্রকারে সমর্থন করছে এবং স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গবর্নমেণ্টকে সরকারী সমর্থন দিয়েছে, তখন আমার স্বদেশস্থিত দেশবাসীদের উচিত, ভারতীয় জনগণের উপর জাপানীদের অত্যাচারের মিথ্যা কাহিনী না রটিয়ে আপাততঃ মুখ বন্ধ করে থাকা। বৃটিশের অধীনে থেকেও যারা বৃটিশের কুব্যবহার নীরবে সহ্য করে নি, তারা পৃথিবীর অন্য কোন বিদেশী শক্তির অত্যাচার কিংবা কুব্যবহার কখনো সহ্য করবে না। অত্যাচারের কাহিনী প্রচার বৃটিশ প্রচারকদের প্রিয় কৌশল। এখন তারা সকল

ভারতীয় ধর্মের—বিশেষ করে ইসলামের রক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতদিন জার্মাণী ও সোভিয়েটের মধ্যে চুক্তি ছিল এবং সোভিয়েটের পক্ষ থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সাহায্য দেবার সম্ভাবনা ছিল, ততদিন বৃটিশ-প্রচারকরা—বিশেষ ভাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচারকার্য্য চালাত যে বলশেভিকরা ধর্ম্ম-বিরোধী। যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে বিপদের সম্ভাবনা এসে পড়ল, তখন তারা প্রচারকার্য্য শুরু করল, জাপানীরা ধর্ম্ম-বিরোধী—বিশেষ করে তারা ইসলাম-বিরোধী। ভারতের মধ্যেই মৌলবী ও পণ্ডিতদের এই শিক্ষায় শিক্ষিত করা হল, তারপর তাদের বিভিন্ন সৈন্য-শিবিরে পাঠানো হল ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে প্রচারকার্য্য চালানোর জন্যে। পূর্ব্ব-এশিয়ায় তারা নবাগত—এই প্রকারের ভাণ করে তারা প্রচারকার্য্য চালাতে লাগল। ভারতে আমরা যে সব লোক পাঠিয়েছি, তাদের জন কয়েক ধরা পড়েছে; তাদের এই মর্ম্মে জাপ-বিরোধী প্রচারকার্য্য করতে বাধ্য করানো হচ্ছে যে জাপানীরা পূর্ব্ব-এশিয়ায় মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছে। আমাদের দিক থেকে এর উত্তর হচ্ছে, পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয় মুসলমানরা এখন মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে হিন্দু, শিখ ও খৃষ্টানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছেন। এই প্রচারের বিরুদ্ধে আরও জোরালো উত্তর, আজাদ-হিন্দ ফৌজে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা হিসাবে সকল সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশী; সেনাবাহিনীর উচ্চতর পদগুলিতে তাঁদের সংখ্যা আরও বেশী। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর এই সব মুসলমান অফিসার সাধারণ লোক নন। তাঁরা ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বংশের সন্তান, দেরাদুনের সামরিক বিদ্যালয় এবং অন্যত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত—এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও সুপরিচিত।

যে সব ভাড়াটে ভারতীয় জেনে শুনে সামান্য লাভের আশায় আত্ম-বিক্রয় করেছে, তাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্য কিংবা তাদের

আমার মতানুবর্তী করবার জন্যে আমি এসব কথা বলছি না। তারা জেনে শুনেই মিথ্যা বলছে, তা আমরা জানি। সাধারণের সম্পর্কিত ব্যাপারে মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানানো কুনীতি। পৃথিবীতে সত্যই শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী হয়, তবু সত্য যাতে সত্বর বিজয়ী হতে পারে আমরা সেই জন্তেই যুদ্ধ করি। এই আধুনিক যুগে, শুধু সামরিক ক্ষেত্রে নয়, প্রচার-ক্ষেত্রেও এই যুদ্ধ চালাতে হয়। সাধারণ জনগণের বিষয়ে আমি বলতে পারি যে, শত্রুর অপপ্রচার তাদের উপর কণামাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এই জন্তে কলকাতা বেতারে বারবার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে হয়, তারা যেন ভারতে প্রেরিত আমাদের সহযোগী ও চরদের প্রচারে প্রভাবিত না হয়। ভারতের মধ্য থেকে আমরা এই মর্ম্মে রিপোর্ট পেয়েছি, আমাদের কার্য্যকলাপে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট শঙ্কিত হয়ে উঠেছে এবং দেশের মধ্যে আমাদের সহযোগী ও চরদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্তে তারা কয়েকটি ভয়ঙ্কর রকমের অর্ডিনান্স জারী করতে বাধ্য হয়েছে। ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্ত এবং ভারতের মধ্যে গত কয়েক মাসে যে সব দলিল-দস্তাবেজ আমাদের হাতে এসেছে, তার মধ্যেও এই অভিমতেরই সমর্থন মেলে।

ভারতীয় জনগণের সামনে যে প্রধান প্রশ্ন, এবার আমি তারই আলোচনা করব। আমার সহ-যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলে আমি ভারতের স্বাধীনতা-অর্জ্জনের জন্তে একটি পরিকল্পনা—বাস্তব পরিকল্পনা রচনা করেছি; খারাপ হোক আর ভালই হোক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নতুন কোন—পরিকল্পনা না পাওয়া যায়, ততক্ষণ আমাদের এই পরিকল্পনাই মেনে নিতে হবে। একমাত্র অপর পরিকল্পনা হচ্ছে, মহাত্মা গান্ধীর "ভারত-ছাড়ো" প্রস্তাব। সে পরিকল্পনা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে আমাদের পরিকল্পনা এবং আমাদের কার্য্যাবলীর আর কোন মূল্য থাকবে না। অপর পক্ষে মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনা যদি ব্যর্থ হয়ে যায়—তবে ভারতের

স্বাধীনতা লাভের সব আশা-ভরসা নির্ভর করবে একমাত্র আমাদের পরিকল্পনার সাফল্যের উপর। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনা যদি সফল হয়, তবে আমাদের চেয়ে বেশী সুখী কেউ হবেনা—কেননা তার ফলে স্বাধীনতা অতি সহজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে পরিকল্পনা যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন স্বদেশে এবং বিদেশে স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়দের পক্ষে আমাদের পরিকল্পনার আশ্রয় করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। যদি বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কার্য্যাবলী প্রকৃতই ব্যর্থ করতে চান, তবে "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাবের ভিত্তিতে মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর নেই।

বিরুদ্ধ পক্ষ মনে করে, তারা আমাকে স্বপ্নদ্রষ্টা বলে অভিহিত করে ছোট করতে পারবে। স্বীকারই করছি আমি স্বপ্নদ্রষ্টা। ভারতের স্বাধীনতার এই স্বপ্ন দেখার ব্যাপারে আমার বিস্তর ভাল ভাল সঙ্গী আছেন। পৃথিবীতে যাঁরা বড় কিছু করেছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা। নেপোলিয়ঁ বোনাপার্টির মতো বস্তুবাদী সৈনিকও ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন-দ্রষ্টা। আমি যদি ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন না দেখতাম, তবে দাসত্বের শৃঙ্খলকে চিরস্থায়ী বলে মেনে নিতাম। স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা যায় কিনা, সেইটাই আসল প্রশ্ন। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা আমি পূরণ করেছি। আঠারো মাসেরও অধিককাল পূর্ব্বে আমি ঘোষণা করেছিলাম, পৃথিবীর কোন শক্তিই আমার ভারত থেকে বহির্গমনে বাধা দিতে পারে নি, আবার সময় পূর্ণ হলে পুনরায় ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করতেও আমাকে পৃথিবীর কোন শক্তি বাধা দিতে পারবে না। তখন লণ্ডনের বি. বি. সি. এবং ভারত-বিরোধী রেডিও আমাকে এই ঘোষণার জন্যে উপহাস করেছিল। আজ তারা এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না। তার কারণ তারা সরকারীভাবে স্বীকার করুক আর নাই করুক, সারা পৃথিবী

জানে যে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা আজ ভারতের মাটিতে যুদ্ধ করছে। মিত্রপক্ষ আজ আমাদের বিরুদ্ধে একমাত্র সমালোচনা যা করতে পারে সে হচ্ছে এই যে আমরা এখন পর্য্যন্ত দিল্লীতে পৌছুতে পারি নি। আমি মণিপুর থেকে ভারতের রাজধানীর প্রকৃত দূরত্ব জানি; ভারতীয় অভিযানের জন্যে তাই আমি মোটামুটি দুবৎসর সময় ঠিক করে রেখেছি। ভাগ্য প্রসন্ন হলে, এ অভিযান তার পূর্ব্বেও সমাপ্ত হতে পারে—কিন্তু লাট-প্রাসাদের উপর আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্যে আমরা অন্ততঃ দু-বৎসর ধরে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছি। বছর খানেক ধরে আমি বলে আসছি, আমাদের পক্ষে ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করা সহজতম কাজ। কিন্তু আমরা একবার ভারতে প্রবেশ করলেই প্রকৃত যুদ্ধ সুরু হবে। ভারতের মুক্তি-যুদ্ধ মানেই বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসের যুদ্ধ। অতএব এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এ যুদ্ধে অন্ততঃ একবারের জন্যও বৃটিশরা প্রাণপণ সংগ্রাম করবে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু-পরোয়ানা সই হয়ে গেছে—শুধু দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করাই বাকী। অবস্থা যখন খারাপ হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মন নিয়ে যাবার জন্যে বৃটিশ প্রচারকরা স্বভাবতঃই চেষ্টা করে। নিজেদের পরাজয় ঢেকে রাখবার জন্যে তারা তখন অন্য কোন রণাঙ্গনে আমেরিকান কিংবা রুশদের সাফল্যের কথা জোরগলায় প্রচার করে। তাও সম্ভব না হলে তারা তখন কোন মজার গল্প বের করে সাধারণের দৃষ্টি দূরে সরিয়ে নিতে চায়। ভারতের পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে বৃটিশদের অবস্থা যখন খারাপ যাচ্ছিল, তখন তারা ভারত-বিরোধী রেডিওর মারফৎ এই মর্ম্মে এক গল্প প্রচার করেছিল যে, আমাদের প্রেরিত বারো জন লোক তাদের দিকে যোগ দিয়েছে; তারা তাদের ছয় জনকে দিল্লী থেকে জাপবিরোধী প্রচারকার্য্য করতে বাধ্য করেছিল। তারা ভেবেছিল, এই ভাবে তারা ভারতীয় জনগণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করবে যে, এই লোকগুলি

আমাদের হয়ে ভারতে কাজ করতে যায়নি—গেছে জাপানীদের হয়ে। যাদের আমরা কাজ করার জন্তে স্বদেশে পাঠিয়েছিলাম, তাদের কয়েকজন ধরা পড়ে যাওয়া অবশ্য দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু বিরাট সংগ্রামে এ জাতীয় ঘটনা ঘটতে বাধ্য। বৃটিশের কর্ম্মরত আমাদের সেই বন্ধুদের ধন্যবাদ,—যাঁরা তাঁদের প্রভুদের প্ররোচিত করে এই ঘটনাটি বেতার মারফত প্রচার করতে পেরেছেন। ভারতীয় জনগণ দিল্লীর বেতার-ঘোষণা থেকে বুঝতে পেরেছে, আমরা যখন সুদূর বেলুচিস্থানে লোক পাঠাতে পারি, তখন ভারতের এমন কোন অঞ্চল নেই যা আমাদের নাগালের বাইরে। যে চারটি লোক ভারত-বিরোধী রেডিও থেকে বক্তৃতা করেছিল, তারা সবাই প্রায় একই ধরণের জাপবিরোধী কথাবার্ত্তা তোতাপাখীর মতো আবৃত্তি করেছিল। এটা সত্যি খুব কৌতুকজনক। আর এটাও কৌতুকজনক যে, এই সব বেতার-বক্তৃতার 'পর, শত্রু-প্রচারকরা আবার এ বিষয়ে অদ্ভুত নীরবতা অবলম্বন করেছে। জার্ম্মানী থেকে ১৯৪১ অব্দে রুডলফ হেস ইংল্যাণ্ডে যাবার পরও ঠিক এমনই ব্যাপার ঘটেছিল; বি. বি. সি. সোৎসাহে এই কথা ঘোষণা করার পর হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল যে "কথা যদিও রৌপ্যবৎ, নীরবতা স্বর্ণবৎ" (Though speech was silver, silence was golden)। সম্প্রতি বৃটিশ প্রচারকরা আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে কয়েকটির দলত্যাগের সম্বন্ধে নতুন গল্প প্রচার করতে বাধ্য হয়েছে। প্রচার-কার্য্যে অত্যধিক ত্বরা খারাপ নীতির পরিচায়ক। তাই আমি আবার ভারত-বিরোধী রেডিওকে সেই বহু-উদ্ধৃত প্রবাদবাক্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: "যে শেষে হাসে তার হাসিই সব চেয়ে ভাল" (He laughs best who laughs last)।

ভারত-বিরোধী রেডিও সম্প্রতি ব্রিটিশ জেনারেল মণ্টগোমারির বড় বড় কৃতিত্বের কথা বলছে। তবু ভাল যে তারা ফিল্ড-মার্শাল লর্ড

ওয়াভেল, কিংবা জেনারেল অকিনলেক কিংবা উভচর অ্যাডমিরাল লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের কথা বলছে না। কিন্তু আমি তাদের মনে করিয়ে দিতে পারি, ইরিট্রিয়া কিংবা আবিসিনিয়ার মতো স্থানে ইটালীয়দের বিরুদ্ধে ছাড়া, বৃটিশরা একা একা এ যুদ্ধে কোন একটি সমরেও বিজয়লাভ করতে পারেনি। জেনারেল মণ্টগোমারী যা কিছু কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন, তার মূলে প্রায় পুরোপুরি আছে আমেরিকার হস্তক্ষেপ এবং আমেরিকার সমর্থন। তা নইলে আমেরিকানরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হবার আগেই বৃটিশরা এই সব যুদ্ধে জয় লাভ করত।

বেশ কিছুকাল ধরে বিরোধী প্রচারকরা গল্প বলে যাচ্ছে, আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানের হাতের পুতুল; তারা জাপানের হয়েই যুদ্ধ করছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা বুঝতে পেরেছে, এ অপকৌশল কাজে লাগছে না। প্রত্যেকেই প্রশ্ন করছে, একটা পুতুল-বাহিনী কি ভাবে এরূপ সাহস এবং জেদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে? তাই প্রচার-কৌশল পালটানো হয়েছে; বিশ্ববাসীদের বলা হচ্ছে, আজাদ-হিন্দ ফৌজ দরিদ্র বাহিনী—তাদের খাদ্য-বরাদ্দ খুব কম, সমর-সজ্জা অপ্রচুর। আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছি বর্ত্তমানে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে আমাদের বিরুদ্ধদলের শুধু তা হলে এই কথাই মাত্র বলার আছে! আমরা কখনও দাবী করিনি যে, আমাদের সেনাবাহিনী ভারতের বৃটিশ সেনাবাহিনীর মত সুসজ্জিত। বৃটিশের পক্ষে ভারত বিমথিত করে তাদের সেনাবাহিনীকে খাওয়ানো পরানো সহজ হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতো বিপ্লবী বাহিনীকে কি অবস্থায় যুদ্ধ করতে হয়, আমাদের সেনাবাহিনী তা পূর্ব্ব থেকেই জানে। বৃটিশ বাহিনী শুধু বিয়ার, রাম, টিনজাত শূকর-মাংস এবং গো-মাংসের জোরেই যুদ্ধ করতে পারে; আর আমাদের সেনা-বাহিনীকে চরম অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যেও যুদ্ধ করতে শেখানো হয়েছে। আয়ার্ল্যাণ্ড, ইটালী কিংবা রাশিয়াতেই হোক কিংবা অন্যত্রই হোক, পৃথিবীর যে কোন

স্থানে বিপ্লবী বাহিনীকে অনুরূপ অবস্থার মধ্যেই লড়াই করতে হয়। প্রত্যেক স্থানে তারাই শেষ পর্যন্ত জিতেছে। আমরাও জিতব। কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে আমাদের রক্ত-মূল্য দিতে হবে।

বৃটিশ প্রচারকরা ভারতীয় জনগণকে বলছে, আজাদ-হিন্দ ফৌজ মণিপুরে এলেও তারা কখনও দিল্লী পৌছতে পারবে না। আমরা এমন কোন তারিখ নির্দেশ করি নি, যে-তারিখের মধ্যে দিল্লী পৌছাবোই। সুস্থ মস্তিষ্ক কোন লোকই তা করে না। ভারত-বিরোধী রেডিওই আমাদের দিল্লী-প্রবেশের কাল্পনিক তারিখ আবিষ্কার করছে, এবং আমরা সেই সময়-তালিকা অনুসারে কাজ করতে পারি নি বলে আমাদের সমালোচনা করছে। পৃথিবীর বহু শক্তির দ্বারা সমর্থিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের মতো শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রায় পাঁচবৎসর ধরে যুদ্ধ করে চলেছে। কিন্তু তারা লাভ করেছে কি? আমরা আমাদের সামান্য সামর্থ্য নিয়ে যদি ভারতীয় অভিযানের সময় দুই বৎসর নির্দ্ধারণ করি, তবে সেটা কি খুব বেশী হবে? ভারত-বিরোধী রেডিও ১৯৪৬-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অপেক্ষা করুক। তখন যেন তারা আমাদের সময়-তালিকায় ভুল হয়েছে বলে আমাদের সমালোচনা করতে সুরু করে।

বিপক্ষ-প্রচারকার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য দ্বিমুখী বলে মনে হয়। প্রথমতঃ, বৃটিশরা যুদ্ধ-জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত—এরূপ ধারণা-সৃষ্টির প্রয়াস; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে জাপবিরোধী মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা। প্রথম উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে তারা প্রতিনিয়ত যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কথা বলছে, যেন জয়লাভ তাদের করতলের মধ্যে এসে গেছে। তারা অন্যত্র মিত্রপক্ষের প্রত্যেকটি সাফল্যকে অতিরঞ্জিত করছে। কিন্তু আমরা যখন তথাকথিত এই সাফল্যগুলি বিশ্লেষণ করি, তখন কি দেখতে পাই? ধরুন, ইটালীতে মিত্রশক্তি কি করছে? তাদের ইটালীতে আরও সৈন্য, আরও সমর-সম্ভার, আরও এরোপ্লেন এবং আরও যুদ্ধ-জাহাজ পাঠাতে

হয়েছে। বর্তমান গতিতে ইটালীর যুদ্ধ কখন শেষ হবে? আর মিত্রবাহিনী ব্রেণার-গিরিবর্ত্ম পার হয়ে জার্ম্মানীতেই বা কখন প্রবেশ করবে? ফ্রান্সে জার্ম্মাণদের প্রত্যাক্রমণ এখনও পূর্ণবেগে আরম্ভ হয় নি; সেখানেই বা সাত সপ্তাহ যুদ্ধের পর মিত্রশক্তি কি করেছে? তারা যে গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তার তুলনায় তারা লাভ করেছে কি? ভারতীয় স্বার্থ-বিচারে মিত্রবাহিনী ফ্রান্স ও ইটালীর যতই অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করবে, আমাদের সুবিধা হবে তত বেশী। তারা যেসব তথাকথিত বিজয়লাভ করেছে কিংবা ভবিষ্যতে করবে, তার ফলে তাদের শক্তিও গুরুতর রকম কমে যাবে। এরূপ সম্ভাবনা এখনও রয়েছে, শেষ পর্য্যন্ত মিত্রশক্তি ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হবে, এবং ইটালীতে তাদের অবরুদ্ধ হবে। ইউরোপের যুদ্ধ প্রথম শেষ করে, তারপর পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানকে পরাস্ত করতে আসার সম্বন্ধে যেসব কথা উঠেছে, সেসব কথা সৈন্যদলে ব্যবহৃত ভাষায় বলতে হয় "বাজে কথা" (Tommy Rot)। আমি ইতিপূর্ব্বে এক বেতার-বক্তৃতায় বলেছি যে, ইঙ্গ-মার্কিণরা কখনও ইউরোপের যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। কিন্তু আমি এমন কথাও বলছি, যদি তারা ইউরোপীয় যুদ্ধে জয়ী হতে পারে, তাহলেও তাদের পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানের সম্মুখীন হবার মতো শক্তি থাকবে না। একথা ভুললে চলবে না যে, যুদ্ধ পণ্যোৎপাদন এবং মানুষের শক্তির সীমা আছে। কাজেই, আজ চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও মিত্রশক্তির পক্ষে অবস্থা নৈরাশ্যজনক।

মণিপুরের কথা যখন আলোচনা করছিলাম, তখন আমি একটি কথা বলতে ভুলে গেছি। সে কথা বেচারী মণিপুরের মহারাজার সম্বন্ধে। তিনি আজ কোথায়? কংগ্রেস-পূর্ব্ব আমলের দেশীয় রাজারা কোথায়? মহারাজা এবং তাঁর পরিবারবর্গ কি অবস্থায় আছেন? এত এত মহারাজা এবং নবাবরা যখন সৈন্য-সংগ্রহকারী সার্জ্জেন্টরূপে কাজ করছেন,

তখন যুদ্ধের সুরু থেকে মণিপুরের মহারাজা এমন নীরব আছেন কেন? আমি তার কারণ জানি। মহারাজা এবং তাঁর প্রজাদের সঙ্গে বৃটিশদের কোন সম্পর্ক নেই। সেদিন পর্য্যন্ত মণিপুরের জনগণ এবং নাগা পর্ব্বতের লোকেরা অর্থাৎ কোহিমা অঞ্চলের লোকেরা—বৃটিশের বিরোধিতা করেছে—এমন কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছে। সেইজন্যেই তারা আমাদের সৈন্যদলের প্রতি এত বন্ধুভাবাপন্ন, আমাদের তারা সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করছে।

গত আড়াই বৎসর ধরে দেশবাসী অবিচ্ছিন্ন জাপ-বিরোধী প্রচার শুনেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি প্রশ্নের উত্তর আজ পর্য্যন্ত মেলে নি। জাপান ছাড়া সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়ায় এমন কোন শক্তি আছে কি, যে ইঙ্গ-মার্কিণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এবং ভারতীয় জনগণকে তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্য করতে পারে? চীন, রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশের সম্পর্কে সহানুভূতির কথা বলা সহজ। কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রতিই সর্ব্বাগ্রে সহানুভূতি জানাতে হবে—আমাদের মুক্তির জন্যে সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের আমরা প্রশ্ন করব, বিভিন্ন ভয়ঙ্কর শক্তি সমর্থিত এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের সাহায্য দেবার মতো পৃথিবীতে আজ কে আছে?" এই সহজ প্রশ্নের জবাবে বুঝতে পারি, জাপান ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাস্তব সাহায্য করার মতো অন্য কোন শক্তি নেই। ১৯৩০ অব্দের জাপানের কথা বিবেচনা করলে চলবে না। এ জাপান আজকের জাপান, যে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তাদের শক্তিক্ষয় করছে এবং এইভাবে আমাদের কাজ সহজ করে দিচ্ছে। এ সেই জাপান, যে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করেছে এবং ভারত সম্বন্ধে তার সদভিপ্রায়ের বাস্তব প্রমাণ দিয়েছে। আজকের জাপান এবং সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়ায় তার নতুন নীতি দেখে পৃথিবীর এ অঞ্চলের ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসী

জাপানের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছে। এই জন্যেই মিত্র-শক্তির পতন না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা জাপানের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে কৃতসংকল্প। ভারতের মধ্যে আজ যে যুদ্ধ চলেছে, সে যুদ্ধ জাপানের নয়—সে যুদ্ধ ভারতের নিজের—তার স্বাধীনতার সংগ্রাম। পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতবাসীদের মতো যদি প্রকৃতই আমরা অকৃত্রিম এবং আত্মত্যাগী হই, তবে আমাদের জয় অনিবার্য্য। উদ্দেশ্য যদি ন্যায়সঙ্গত হয় এবং সেই উদ্দেশ্যের ধারকরা যদি হয় সাধু এবং একনিষ্ঠ—যেমন আমাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে—তবে শেষ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের শক্তি পরাস্ত হবেই। আমরা যুদ্ধ করতে এবং যুদ্ধে জয়ী হতে কৃতসংকল্প। সকলে এগিয়ে আসুন—সাহায্য দিয়ে আমাদের কাজ সহজ করে তুলুন।

জয় হিন্দ!

বেতার-বক্তৃতা: ১১, জুলাই, ১৯৪৪

হিন্দী কৌমী তরনো

(ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত)

এই জাতীয় সঙ্গীতটি রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ মন অধিনায়ক' গানের অনুসরণ করে হিন্দী ভাষায় লেখা। নেতাজির অনুমোদনে সর্ব্বত্র এই গান গাওয়া হত। সুর সহযোগে এই জাতীয় সঙ্গীত শেখবার জন্য নেতাজি সকল ভারতীয়কে নির্দেশ দান করেন।

শুভ সুখ চৈন কী বর্ষা বরষে, ভারত-ভাগ হৈ জাগা
পাঞ্জাব সিন্ধ গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
চঞ্চল সাগর বিন্ধ্য হিমালা নীলা যমুনা গঙ্গ
তেরে নিত গুণ গায়ে
তুঝ-সে জীবন পায়ে

সব তন্ পায়ে আশা

সূরজ বনকর জগপর চমকে ভারত নাম সুভাগা

জয় হো জয় হো জয় হো

জয় জয় জয় জয় হো ॥ ১

সব-কে দিল মেঁ প্রীত বসায়ে তেরী মীঠী বাণী

হর সুবে-কে রহনে বালে, হর মজ্ হব্-কে প্রাণী

সব ভেদ-ও-ফরক মীটা-কে

সব গোদমেঁ তেরী আকে

গূঁথেঁ প্রেম-কী মালা

সূরজ বনকর জগপর চমকে ভারত নাম সুভাগা

জয় হো জয় হো জয় হো

জয় জয় জয় জয় হো ॥ ২

সুবাহ্ সবেরে পঙ্খ্-পখেরা তেরে-হী গুণ গাঁয়ে

বাস-ভরী ভরপুর বায়েঁ জীবন-মেঁ রুত লায়েঁ

সব মিল কর হিন্দ পুকারে,

"জয় আজাদ-হিন্দ কে নারে,

প্যারা দেশ হামারা।"

সূরজ বনকর জগপর চমকে ভারত নাম সুভাগা

জয় হো জয় হো জয় হো

জয় জয় জয় জয় হো

ভারত নাম সুভাগা ॥

বাংলা অনুবাদ

শুভ সুখ ও শান্তির বর্ষা বর্ষিত হচ্ছে। ভারতের ভাগ্য জাগ্রত হয়েছে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ, চঞ্চল সাগর, বিন্ধ্য-হিমালয়, নীল যমুনা ও গঙ্গা নিত্য তোমারই গুণ গায়; তোমার কাছ থেকেই জীবন পায়; এবং সমস্ত তনু (তোমার কাছ থেকে) আশা পায়। ভারতের এই সৌভাগ্যশীল নাম সূর্য্য হয়ে (সূর্য্য বনে গিয়ে) জগতের উপর দীপ্তি পায়। তোমার জয় হোক।

তোমার মিষ্টবাণী সকলের চিত্তে প্রীতিস্থাপন করে; সমস্ত সুবার (প্রদেশের) অধিবাসীরা এবং সকল ধর্মের জনগণ সব ভেদ ও পার্থক্য দূর করে তোমার কোলে এসে প্রেমের মালা গাঁথুক। ভারতের এই সৌভাগ্যশালী নাম সূর্য্য হয়ে জগতের উপর দীপ্তি পায়। তোমার জয় হোক।

প্রাতঃকালে নানা জাতীয় পাখী তোমারই গুণ গায়। সুবাসে ভরা পরিপূর্ণ হাওয়া জীবনে সাড়া আনে। সকলে মিলে ভারতের নাম ঘোষণা করে। "স্বাধীন ভারত-পতাকার জয়! আমার প্রিয় দেশ!" ভারতের এই সৌভাগ্যশালী নাম সূর্য্য হয়ে জগতের উপরে দীপ্তি পায়। তোমার জয় হোক, ভারতের এই সৌভাগ্যশালী নাম।